চতুর্থ অধ্যায়

আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পের শিল্পরূপ

চতুর্থ অধ্যায়
আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পের শিল্পরূপ

আশাপূর্ণা দেবী তাঁর রচনায় যে রচনারীতি ও শিল্পরূপ ব্যবহার করেছেন, তাতে নানা বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। যেমন — প্রথমেই প্লট গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর একটা সহজ-সরল দৃষ্টিভঙ্গিই সাধারণত গোচরীভূত হয়। প্লট হচ্ছে একধরনের শিল্পকৌশল। কার্যকারণ সূত্রে যখন কোন গল্প গ্রথিত হয় তখনই হয় প্লটের জন্ম। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পে যেসব প্লটের কথা বলেন তা প্রায়শই পরিপূর্ণভাবে নিখুঁত এবং সুদৃঢ় নয়। কারণ তিনি যে গল্পগুলো লেখেন তাতে যেন কোথায় এক কথক ঠাকুরের আবির্ভাব ঘটে। আবার কখনো মনে হয় আমাদের ঘরের কথাগুলো যেন গল্পের ছলে কেউ আমাদের শুনিয়ে যাচ্ছে। তার গল্পের গ্রন্থন যে সর্বত্র নিপুণতা অর্জন করেছে তা নয়, কখনো তা শিথিল অবস্থায়ও রয়েছে। অর্থাৎ প্লটের যে গঠন এবং গ্রন্থন রয়েছে তা বেশিরভাগ সময়েই সরল ও সহজ ভাবে বর্ণিত। কারণ কি লিখছেন সেটাই বড় কথা, কিভাবে লিখছেন তা নয়।

সমাজে যে ভাঙন বা অবক্ষয় শুরু হয়েছে তার মূলে দেখা দিচ্ছে আত্মসুখের প্রবণতা। বিশেষতঃ নারীদের ক্ষেত্রে। একান্নবর্তী পরিবারগুলোতে সুখ এবং শান্তি প্রায় পাশাপাশি অবস্থান করলেও বহির্জগতে তখন পরিবর্তনের হাওয়া প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। সেই তরঙ্গিত সমীরণের আঘাতে মধ্যবিত্ত সংসারও দুলতে শুরু করেছে। তখনই বহু অভিভাবকের শাসন দ্বারা পরিবৃত সংসারে বসবাস করা থেকে নিজেকে বিরত করে স্বাধীন, ছোট্ট, সুখী সংসারের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে নারীরা। এই আত্মসুখই অতীতের আভিজাত্য-বোধকে ভেঙ্গে দিচ্ছে, জন্ম নিচ্ছে স্বজনহীন ছোট ছোট পরিবার। এই বিষয়ভাবনাগুলোকেই আশাপূর্ণা দেবী 'প্লট' হিসেবে নিয়েছেন। আর সে কারণেই লেখিকার রচনায় সামাজিক প্রেক্ষাপটের ঘটনার ঘনঘটায় মুখ্য হয়ে উঠেছে।

সমাজে বসবাসকারী মানুষকে সর্বপ্রথম যা মেনে চলতে হয় তা হচ্ছে সমাজের নিয়মকানুন, প্রথা, সংস্কার, এই নীতিতেই আশাপূর্ণা দেবী স্বয়ং বিশ্বাসী ছিলেন। এছাড়া আরো একটা বিশ্বাস তাঁর ছিল যে, সহজ কথা সহজ করে বলতে পারা। যে কারণে আধুনিক ছোটগল্পকাররা আঙ্গিক নিয়ে বিশেষভাবে সচেতন হওয়া সত্ত্বেও তিনি এগুলো নিয়ে একেবারেই বিচলিত ছিলেন না। কারণ তিনি তাঁর চোখের সম্মুখে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে সহজ-সরল-হৃদয়স্পর্শী করে বিকশিত করতে চাইছেন বলে সেখানে সংলাপটাই প্লটের চাইতে মুখ্য হয়ে উঠেছে। আর সে কারণেই তাঁর গল্পে প্লটের সুদৃঢ়

ভিত্তি তাঁকে ভাবাত না। তিনি চাইতেন অতি পরিচিত বিষয়বস্তুকে গল্প বলার ভঙ্গিমায় পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করতে, কারণ গল্প শোনার প্রবণতা মানুষের চিরকালের। এই সহজ সরল প্রচেষ্টার আঙ্গিকই তাঁর বহু সার্থক ছোটগল্পের সাফল্যের মূলে অবস্থান করছে।

প্লটের ব্যাপারে আশাপূর্ণা দেবী নিজেই বলেছেন — "শিল্পী মাত্রেই নিজস্ব মনোভঙ্গীর অনুকূলে তার শিল্পের উপকরণ বেছে নেয়। আমার বেছে নেওয়া উপকরণ হচ্ছে — সাধারণ সমাজবদ্ধ ঘরোয়া মানুষ। নিতান্তই সাধারণ, যে সাধারণেরা শুধু প্রাণপাত করে দিনের ঋণ শোধ করে চলে।" *(পৃ. ১৯, আশাপূর্ণা দেবী রচিত "আর এক আশাপূর্ণা")*। আরও বলেছেন — "এদের জীবনে রোগ শোক দারিদ্র্য আর আকস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া কোন নাটকীয় ঘটনা বড় একটা ঘটে না, তাই তাদের আত্মার ক্রন্দনধ্বনি কখনই উত্তাল হয়ে বাজে না। শুধু কান পাতলে শোনা যায়। সেই অস্ফুট ধ্বনিটুকুকে পৌঁছে দেওয়াই আমার সাহিত্য"। *(পৃ. ২০, ঐ)*। কান পেতেই তিনি অফুরন্ত চলমান জীবনের ধ্বনি শুনতেন, সেজন্যেই তাঁর রচনায় কোনদিন প্লটেরও অভাব হয়নি এবং তার বৈচিত্র্যেরও অভাব হয়নি। কারণ, তিনি নির্মমভাবে শিল্পী হস্তে সত্যকে উন্মোচন করতেন। চিরন্তন স্নেহের সম্পর্কের মধ্যেও সত্যকে সন্ধান করে নিষ্ঠুরকে উদ্ধার করেছেন, যেমন 'ছিন্নমস্তা' গল্পে মা জয়াবতী, 'আয়োজন' গল্পে ঠাকুর্দা লোকনাথ — প্রভৃতি চরিত্র।

প্লট সরল, জটিল, বৃত্তাকার, শিথিল প্লট প্রভৃতি নানা প্রকারের হলেও আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পে কিন্তু সরল প্লটের প্রাধান্যই আমরা বেশি দেখতে পাই। ছোটগল্পের প্লটে থাকে কালচেতনা, স্থান এবং পাত্রের উপস্থিতি। 'ছিন্নমস্তা'তে শুরুতেই যেমন দেখতে পাই সময় সন্ধ্যা, পাত্র জয়াবতী ও স্থান বাড়ি। সাধারণভাবে স্নেহ বৎসলা মাতৃমূর্তি, নবপুত্রবধূর আগমনে আনন্দিতা জয়াবতী ও তার সংসারজীবন নিয়ে শুরু হয়েছে গল্পের বয়ন। সামান্য ডাঁটা চচ্চড়ি খেতে ভালোলাগা একদিকে, আর অপরদিকে সংসারের অন্যান্য কিছু চরিত্রগুলোর স্বাভাবিক পরিণামের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাওয়াতেই চলে গল্পের বুনন। এই পরিবেশই জয়াবতীকে ব্যঙ্গ ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে এক ক্রূর পরিস্থিতিতে নিয়ে গেল।

জয়াবতীর পুত্রবধূ প্রতিভা বিধবা শাশুড়ীর অন্তর্যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করতে না চেয়ে বরং আরো ব্যঙ্গের কশাঘাতে তীব্র করে তুলেছে। বাৎসল্য প্রেম থাকা সত্ত্বেও জয়াবতী তীব্র অপমানে জর্জরিতা হয়ে নিজের সন্তানের রুধির পানে অন্তরের অন্তঃস্থলে তৃপ্তি বোধ করেছেন — এই চিত্র ফুটিয়ে তোলাতেই আশাপূর্ণা দেবীর দক্ষতা। প্রতিভা ব্যঙ্গের প্রত্যাঘাত পেয়েছে, কিন্তু শোধরাবার তার আর উপায় নেই। কিন্তু জয়াবতী 'ছিন্নমস্তা'র মতো নিজের রক্তপান করলেও আঘাতকে ফিরিয়ে দিতে পেরেছে। গল্প শুরু আর শেষের জয়াবতীর মনঃপ্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। গল্প যেখান থেকে শুরু হয়েছে ক্রমাগত তা পরিণতির দিকেই এগিয়ে গিয়েছে।

অর্থাৎ আশাপূর্ণা দেবীর রচিত গল্পের প্রায় প্রতিটিতেই এই সরল প্লটের প্রাধান্যই চোখে পড়ে। আশাপূর্ণা ছিলেন বহির্জীবনের অন্তরালেও যে জীবনের স্রোত বয়ে চলে তার কারবারী, যেখানে মানুষ আপন চিত্তবৃত্তির কাছেও অসহায়, যেখানে নিজেকে ঘিরে জালিকাবৃত্ত রচনা করে নিজেই পুনরায় সেখানে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে।

আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পগুলোর মধ্যে শিল্পরূপের দিকগুলো প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে তার মধ্যে রীতি হল একটি বিশেষ দিক। যেমন তিনি সাধারণত কোন গল্পই আত্মকথনরীতিতে রচনা করেন নি। এই রীতিতে কোন গল্প বা উপন্যাসের চরিত্র নিজের মধ্যে নিজেকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য, চাহিদা ও একান্ত আপনার একটা স্বরূপকে আবিষ্কার করতে চায়। কোন মানব বা মানবীর মধ্যে যখন সমস্যা বা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং তা ঘনীভূত হয়ে কোন আবর্ত সৃষ্টি করতে থাকে তখন সেই চরিত্রের মধ্যে শুরু হয় টানাপোড়েন, আবির্ভাব হয় পক্ষে-বিপক্ষের যুক্তি নিয়ে নানা দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতির। তখনই সেই চরিত্রটি নিজের অন্তর্নিহিত সত্তার অস্তিত্ব, তার উৎস, অস্তিত্বের গভীর তলদেশে ডুব দিয়ে নিজের মনের রত্নগুলোর সন্ধান করে থাকে। একের পর এক আবরণ যত ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকে ততই স্বতন্ত্র একটা রূপ চরিত্রের নিকটবর্তী হতে থাকে আর তাকে বিশ্লেষণের জন্য একান্ত নিজস্ব অনুভূতির কথা নিজেই যেন বলে যেতে শুরু করে — এভাবে আত্মকথন রীতির তাগিদ চরিত্ররা অনুভব করে। কিন্তু আশাপূর্ণা দেবীর চরিত্ররা এই কাজটি সাধারণত করেন না। কারণ তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা এই ধরনের দ্বন্দ্ব আর দোলাচলতায় খুব বেশি পড়েন নি।

আশাপূর্ণা দেবী সমাজকে তাঁর গল্পে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। মানুষ কোন না কোন সমাজের অধীনে বসবাস করে। সেখানে তিনি প্রায়শই মধ্যবিত্ত সমাজকে দেখিয়েছেন, কখনো বা উচ্চবিত্ত, আবার কখনো বা নিম্নবিত্ত ও বস্তীবাসীদেরও দেখিয়েছেন, তবে তাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। সমাজ অভ্যন্তরস্থ মানুষের সামাজিক জীবনকেই তিনি মুখ্য করে নিয়েছেন, তাই তাঁর গল্পে বিকশিত হয়ে উঠেছে সামাজিকতা, লৌকিকতা। এখানে নিজস্ব স্বরূপ ব্যক্ততার কোন আকুলতা নেই। সমাজ প্রেক্ষিতে পারিবারিক ঐতিহ্যকে, প্রথাকে এবং রীতি নীতিকেই আলোকিত করতে চেয়েছেন। সমাজে বসবাসকারী মানুষেরা, যারা আমাদের চোখের সামনে নিয়তই রয়েছে। যাদের নিয়ে কোন গল্প হতে পারে বলে সচরাচর কোন মানুষ ভেবে উঠতে পারে না, তাদেরই তিনি উপাদান হিসেবে বেছে নিয়েছেন। সেক্ষেত্রে নারীরাই পেয়েছে প্রাধান্য। কারণ সংসারে নারীদের ভূমিকাটাই আশাপূর্ণা দেবীকে আজীবন ভাবাত। পুরুষরাই যে একমাত্র সবকিছু নয়, নারীরাও যে জীবনের পূর্ণতার জন্য অর্দ্ধেক গৌরব দাবী করতে পারে সেটাকেই বারংবার উপলব্ধি করেছেন। আর: নারীরা তখনও ব্যক্তি পরিচয়ে পরিচিত হতে শুরু করে নি, তাই নারীদের পরিচয়ের প্রধান বাহক হয়ে উঠেছে পারিবারিক

ঐতিহ্যগুলোই। সমাজ ছাড়া কোন মানুষের অস্তিত্ব তিনি দেখতে চাননি, দেখাতেও চাননি। পরিবারগুলোকে নিয়ে তৈরি হচ্ছে সমাজ এবং পরিবরের ভাঙাগড়ার ফলে যে নতুন ধারার সংযোজন ঘটছে তার মধ্য দিয়েই পরিবর্তন ঘটছে সমাজের। সেই সমাজ এবং সমাজবদ্ধ মানুষকেই তিনি তার রচনায় ধরতে চেয়েছেন। আর এসব কারণেই আশাপূর্ণা দেবীর রচিত ছোটগল্পগুলোতে আত্মবিশ্লেষণ প্রাধান্য পায় নি।

আশাপূর্ণা দেবী রচিত ছোটগল্পে সাধারণত অতীত স্মৃতিচারণাও নেই। স্মৃতির প্রবাহ ধরে সন্তরণ করতে করতে ভেসে চলাকে তিনি ব্যবহার করেন নি, তিনি চোখের সম্মুখে যা দেখেছেন, সমসাময়িককালে, তাকেই প্রকাশ করেছেন। ঘটনার যেকোন একটি কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে সমস্ত জীবন ও ঘটনাকে বিশ্লেষণ করা অনেক সাহিত্যিকের সাহিত্য কর্মেই রয়েছে কিন্তু আশাপূর্ণা দেবী যেমন চলমান জীবন থেকে চরিত্রকেও নিয়েছেন তেমনি গ্রন্থনার ক্ষেত্রেও গল্প বলার ভঙ্গিমাটিকেই গ্রহণ করেছেন। তিনি একেবারে সহজ সরলভাবে, যেন স্বচক্ষে দেখেছেন এভাবে ঘটনার বর্ণনা করে গেছেন; যেন দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়েছে পর্যায়ক্রমে সে সব ঘটনাগুলো। কিন্তু তিনি একবারও ঘটনাগুলোর পরিণতি কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে কোন কথা বলেন নি। তাই তিনি বলেছেন — "যা দেখি তাই লিখি। আর পরে ভাবতে চেষ্টা করি কেন এমন হয়? আমি কখনও 'এইটা হওয়া উচিত' একথা মনে করে কিছু লিখিনি। জানি কি হয় সেটাই বলবার। কি উচিত বলবার আমি কে?" — *(পৃ. ১৭, 'আর এক আশাপূর্ণা')*।

স্মৃতিচারণা করতে গেলেই নিজের মনের অন্তর্গহনে ডুব দিতে হয়। একটা মানুষের জীবনে অজস্র ঘটনা ঘটে থাকে, সেগুলোর মধ্য থেকে স্মৃতির সূত্র অনুযায়ী খণ্ড খণ্ড ঘটনাকে সাজিয়ে নিয়ে একটি অখণ্ড রূপ দেওয়ার জন্য চাই চরিত্রের গাম্ভীর্য। যা নাকি আশাপূর্ণা দেবীর গল্প রচনায় অত্যন্ত কম সংখ্যক রয়েছে। আর যারা রয়েছে তারা এই রীতির নিকটবর্তী হন নি। গল্প বলা এবং গল্প শোনার প্রতি যে একটা ভালোলাগা তা মানুষের মধ্যে চিরকালই বিরাজিত, তাই এই রীতিটিই যেন সকলের প্রাণ স্পর্শ করে যায়। লেখিকা তাই সাধারণ মানুষের কথাগুলোও অত্যন্ত সাধারণভাবেই বলতে চেয়েছেন। যে সমস্ত চরিত্র নিজের চারিত্রিক দৃঢ়তার গুণে ব্যক্তিত্বময়ী হয়ে উঠেছে তারাও নিজেকে প্রকাশ করবার সময় সহজ পদ্ধতিকেই অবলম্বন করেছে কিন্তু এর মধ্য দিয়েই একটা নিজস্ব পরিমণ্ডল যেন গড়ে তুলতে পেরেছেন।

ছোটগল্পের উপাদান জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে এবং পদক্ষেপেই রয়েছে। যে কোন কিছুই ছোটগল্পের উপাদান হয়ে উঠতে পারে বলে আন্তন চেকভ মনে করতেন। কিন্তু সে যাই হোক না কেন তার সঙ্গে যেন জীবনের একটা গভীর সংযোগ থাকে সেদিকে নজর রাখতে হবে। আর তাকে সুচারুরূপে বিকশিত করার জন্য প্রয়োজন হয় 'প্রতীক'-এর (symbol)। যার ব্যবহার নাকি

নাট্যকার শেক্সপীয়ারের সময় থেকে চলে আসছে বর্তমানকাল পর্যন্ত। লেখক তার ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী সামাজিক পরিবেশের প্রকৃতি অনুযায়ী এবং সর্বোপরি লেখকের নিজস্ব যে একটা শিল্প সম্পর্কিত বোধ, তার প্রকৃতি অনুসারে প্রতীকের ব্যবহার করে থাকেন। প্রতীকই ছোটগল্পের crisis point কে দৃঢ় করে তুলতে সহায়তা করে। তাই গল্পকার তার সৃষ্টিকে সুস্পষ্টরূপ দেবার জন্য চলমান জীবন থেকেই নিজস্ব অভিজ্ঞতা সঞ্জাত প্রতীক ব্যবহার করে থাকেন। কারণ এই প্রতীকই গল্পের সঙ্গে পাঠকের আন্তরিক যোগসূত্র স্থাপন করবে এবং গল্পের ব্যঞ্জনাবহ প্রাণোচ্ছল গতির জন্য একটি পথ নির্মাণ করে দেবে। তাই প্রতীক হবে নিখাদ, যা গল্পের আত্মাকে করে তুলবে নিজস্ব বলে বলীয়ান। আর সুদক্ষ শিল্পীমাত্রেই এই ব্যাপারে সাধারণ জিনিসকেও ব্যবহার করে সার্থক ছোটগল্প রচনা করতে পারেন। আশাপূর্ণা দেবীও তাঁদেরই একজন ছিলেন।

আশাপূর্ণা দেবী তাঁর প্রায় সমস্ত ছোটগল্পেই যে প্রতীকের ব্যবহার করেছেন, তা হল অট্টালিকা। প্রায় অধিকাংশ গল্পেই রয়েছে অট্টালিকার ব্যবহার। প্রায়শই তিনতলা রয়েছে, কখনো বা দোতলা, ন্যূনতম হলেও একতলা তো বটেই। শুধু তাই নয়, গ্রামের যে সমস্ত বাড়িঘরের বর্ণনা আছে তাদেরও বেশিরভাগটাই পাকা ও দোতলা বাড়িও আছে। শ্রী-যুক্ত অট্টালিকা বনেদীয়ানার প্রতীক আর শ্রী-হীন অট্টালিকা হচ্ছে ভাঙনের প্রতীক। কুঁড়েঘরের সংখ্যা প্রায় নেই বললেই চলে। কারণ তিনি মধ্যবিত্ত সমাজকে বেছে নিয়েছিলেন যেহেতু, তাই সেরকম ভিত্তিটাই রয়েছে। মানুষে চারিত্রিক দিক বদলায়, মূল্যবোধ, সাংসারিক চালচিত্রে ঘটে পরিবর্তন কিন্তু স্থাপত্যের নিদর্শন যে অট্টালিকা — তার তো কোন পরিবর্তন ঘটা সম্ভব নয়। আর তাই বাড়িঘরই প্রমাণ করে দিচ্ছে কোন কালের এই পরিবারটির বনেদীয়ানার ঐতিহ্যকে। একান্নবর্তী পরিবারের বহুজনের মধ্যে থাকার যে মূল্যবোধ আদর্শবোধ ছিল তা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে। যে সময়টাতে একান্নবর্তী পরিবারগুলো একটি সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে, সে সময়টাকে লেখিকা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করেছেন। পরিবারগুলোর কর্তা-গিন্নীরা তাদের ভ্রাতা, ভগ্নী, আত্মীয়-পরিজন, আশ্রিত, আশ্রিতাদের নিয়ে বসবাস করতেন। পরিবারের সকল সদস্যরা তাদের প্রাচীন বংশগৌরবকে আঁকড়ে থাকতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ব্যয় অনুযায়ী আয়ের পথ ততটা সুগম ছিল না, ফলে ভেতরে দেখা দিচ্ছিল ভাঙন। অনেক বাড়িতে ঠাকুর চাকর ছিল প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম এবং অনেক বাড়িতে তা আবার ছিলও না। এভাবে পরিবারগুলোকে একসূত্রে বেঁধে রাখবার দুরূহ প্রচেষ্টা চলত কিন্তু তথাপি একান্নবর্তী ভাবনার ধারাটি অবক্ষয়ের দিকে যাচ্ছিল। আর সেই সূত্রে সমাজেও অবক্ষয় ত্বরান্বিত হচ্ছিল। এই অবস্থাটার প্রতীক হিসেবে অট্টালিকাগুলো ভগ্ন, কুৎসিত চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাড়িগুলোতে রং তো দূরঅস্ত, পলেস্তারা নেই বললেই চলে। বৈদ্যুতিক সংযোগও সব বাড়িতে ঠিকমতো না থাকায় গুমোট অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। লোকসংখ্যার ক্রমবর্ধমান পরিণতি ঘরগুলোতে অকুলান

হয়ে উঠছিল। গৃহগত পরিবেশটি আলো বাতাসযুক্ত, উদার উন্মুক্ত না হওয়ায় মানুষগুলোও যেন ঠাসা গুমোট ও অস্পষ্ট হয়ে উঠছিল। খোলা ছাদের মুক্ত বায়ুতে শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার জন্য অনেকেই ওপরে উঠে আসতো। বাইরের জগতের মুক্তি তাদের আকর্ষণ করত, আলোয় ফিরতে চাইত। যাদের সামর্থ্যে কুলিয়ে উঠত তারা এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আলাদা বসবাস করার কথা ভাবলেও কেউ কিন্তু ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য প্রাচীন অট্টালিকাকে নতুন করে সুসজ্জিত করে তোলার কথা ভাবত না। এই যে খণ্ড খণ্ড রূপ অখণ্ডতাকে ভেঙ্গে দিচ্ছে এভাবেই যেন বাড়িগুলো আরো প্রাচীন হয়ে ক্রমাগত একটা ভগ্নস্তুপ বা ধ্বংসাবশেষে পরিণত হচ্ছে। একদা যে বহুতল বাড়িগুলো নির্মাণ করার আর্থিক ক্ষমতা এই বাড়িগুলোর কর্তা-ব্যক্তিদের ছিল এবং বাড়ির মত শক্ত ভিত কর্তাদের শাসনেও ছিল তা বোধগম্য হয়। কিন্তু জীর্ণ বাড়ির মতো পরিবারের কর্তৃত্বও যে জীর্ণ হয়ে গেছে তার চিত্রকে সুপরিস্ফুট করে তোলার জন্যই লেখিকা এই প্রতীকটিকে গ্রহণ করেছেন। অট্টালিকার ভগ্নদশা আসতো পারিবারিক একতার ভাঙনের চিত্র। একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনে, নূতন বাতায়ন তৈরি হয়েছে, যেখান থেকে আর পুরোনো ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া যাবে না। তাই ভগ্নদশার নবীকরণ অর্থাৎ শ্রী-যুক্ত করার চিহ্ন নেই। ঐতিহ্য-আদর্শ-মূল্যবোধ নষ্ট হচ্ছে। এগুলো আর নূতন বাতাবরণে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। বর্তমান সমাজে এই পরিবারকেন্দ্রিকতা, জোটবদ্ধ সংসারজীবন যেমন বিরলদৃশ্য, তেমনি এই প্রাচীন অট্টালিকাগুলোও আজ অদৃশ্য। ঘরের ভেতরের গুমোট চিত্র যেন অন্দরমহলের নারীদের ভেতরে বদ্ধ অবস্থায় যে ক্রোধ, আক্রোশ, হিংসা চাপা থাকত তারই প্রতীককে তুলে ধরে।

'আমায় ক্ষমা করো', 'অঙ্গার', 'অভিশপ্ত', 'অনুপমার ঘর উদ্বাস্তু', 'বেহুঁশ', 'তাসের ঘর', 'নেশা', 'একটি ভাঙাচোরা গল্প', 'স্বাধীনতার সুখ', 'নীলকণ্ঠ', 'অভিনেত্রী' ইত্যাদি গল্পে অট্টালিকার প্রতীক লক্ষ করা যাবে। 'আমায় ক্ষমা করো' গল্পে যেমন মজুমদার বংশের অতীত মহিমার মূক সাক্ষী হিসেবে রয়ে গেছে বাড়ির পুরানো প্রাসাদ-শ্রেণি। "প্রায় আধখানা গ্রাম জুড়িয়া যে ধ্বংসপ্রায় প্রাসাদ-শ্রেণি" 'একদিন নাকি ইঁহাদের "রাজা" বলিয়া খ্যাতি ছিল' — প্রভৃতি বাক্যগুলো প্রমাণ করে বর্তমান মজুমদার বংশের অতীত গৌরবের কথা। বাড়ির মহলগুলোর বর্ণনায় আরো ইতিহাস — 'বারমহল', 'অন্দরমহল', 'কাছারিঘর', 'নাটমন্দির', 'দূর্গাদালান', 'ভোগমণ্ডপ', 'রান্নাবাড়ী'। এই শব্দগুলোর ব্যবহার থেকে সহজেই অনুমেয় সেই বাড়িটির শ্রী ও সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্যশালী, জমিদারী কাঠামোর রূপ। এ প্রসঙ্গে আশাপূর্ণা দেবী আরো বলেছেন — "তাহার (বাড়ীটির) সামনে মাথাটা আপনিই কেমন নত হইয়া আসে, আর আসে একটা 'হায় হায়' ভাব ... কেমন ছিল সেই বিচিত্র সমারোহের কোলাহলময় দিনগুলি ... কেমনই বা ছিল ইহাদের অধিবাসীরা ..." — *(পৃ. ৭০ গল্পসমগ্র ২য় খণ্ড)* পূর্ব্বে বনেদীয়ানাকে শ্রী হীনভাবে পড়ে থাকা অট্টালিকার মধ্য দিয়ে স্মরণ করা ছাড়া আর

কোনভাবেই তাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় বলেই নূতন করে শ্রী যুক্ত করার প্রয়াস নেই।

গল্প যে সময়ে গড়ে উঠছে সে সময়টা কিন্তু এই বিরাট প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। "অন্দরমহলের মধ্যে যে ঘরগুলো এখনো কোন প্রকারে টিকিয়া আছে তাহারই একখানিতে থাকেন "নতুনগিন্নী"। নবদ্বীপ মজুমদারের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। সত্তরের কাছাকাছি বয়স, মাজাভাঙা খুনখুনে বুড়ি, চোখের চাহনি নিষ্প্রভ, শুধু গলার জোর আছে সমান।" একদিন যেমন বিশাল প্রাসাদ শ্রেণি গ্রামের ঐতিহ্যকে বিশালতা দান করেছিল, পরিবারের বংশগৌরব বৃদ্ধি করেছিল — তা যেমন আজ বিলুপ্তির পথে তেমনি পরিবারের সদস্যদের সংখ্যাও বিলুপ্তির পথে। এক রয়েছেন ধ্বংসপ্রাপ্ত শেষ পুরুষের পূর্বপুরুষ 'নতুন গিন্নী' — যার অস্তিত্বও প্রায় ধ্বংসের পথে হলেও কণ্ঠস্বরের দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টির ওপর অভিসম্পাত করতে করতে বেঁচে আছে। অর্থাৎ কিন্তু ভগ্নাবশেষ অট্টালিকার মতোই তারও অবস্থা। আর রয়েছেন বংশের শেষ পুরুষ সমুদ্র নারায়ণের সুলক্ষণা, গুণবতী স্ত্রী হৈমন্তী। যে নিজেও আজ প্রায় অস্তমিত, যে কোন কারণে স্বামী নিরুদ্দেশ, আর সে যেন স্বামীর আরাধনায় এবং বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে একখানি নির্মল, শুচিস্নিগ্ধ জীবন অতিবাহিত করছে।

'অঙ্গার' গল্পে একসময়ের জমিদার বাড়ীর জীর্ণ, শীর্ণ চেহারা ধরা পড়েছে লেখিকার লেখনীতে। "বেশী রাত্রে সুকান্ত বাড়ী ফিরে দেখল দোতলার একটা ঘর যথাসম্ভব পরিষ্কার করে তার বিছানাটা রয়েছে পাতা।" — *(পৃ. ১১১, ঐ)*।সুকান্ত কোলকাতায় চাকরিসূত্রে বসবাস করছে, কিন্তু বাড়ি মেরামত করতে এসে দেখে এই দোতলা বাড়িরই আর এক অংশীদারের ঘরের দুর্গতি। যেখানে খাওয়ার মুখ আছে অনেক কিন্তু রোজগারের লোক কেউ নেই। গ্রামের ঐতিহ্যপূর্ণ বাড়ির বৌ হয়েও চুরি ছ্যাচড়ামি অর্থাৎ এককথায় যাকে বলে 'হাতটান' এর কাজ করে সংসারটাকে ধরে রেখেছে অতিশয় কষ্টে। তাই যখন সুকান্ত বলে — "আচ্ছা, ভাঙাবাড়ি মেরামত করবার কি এত দরকার সুকান্ত, এ যাত্রায় না হলেই বা ক্ষতি কি?... আরো চৌদ্দ বছরের ঝড়-বৃষ্টি-ভূমিকম্পে ধসে পড়ে যাক না ফাট ধরা নোনা লাগা পচা দেওয়ালগুলো" — *(পৃ. ১১৩, — ঐ)*। পরিবারটির পারিবারিক ঐতিহ্য যেমন পথের ধূলায় এসে মিশেছে তেমনি বিরাট বাড়ির ভগ্নদশাগ্রস্ত অট্টালিকাও পথের ধুলোয় নিজেকে লীন করে দিতে চাইছে যেন।

হৃত বংশগৌরব নিয়ে 'অভিশপ্ত' গল্পেও বিরাট প্রাসাদ-শ্রেণি তার কৌলিন্য হারিয়ে ভগ্নদেহে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেমন — "দক্ষিণের দোতলাটা সমস্ত ধ্বসে গিয়ে একতলার ছাদে জন্মেছে আগাছার জঙ্গল, আর নাটমন্দিরের জয়গায় খানিকটা জমাট অন্ধকার। দিনেরবেলা দেখা যায়, দু'শতাব্দী আগের ছোট ছোট পাতলা ইঁট, গোল চৌকো অদ্ভুত সব আকারের —" *(পৃ. ১৬৩, ঐ)*।

"দেউড়ির খিলানটার একটা স্তম্ভ কবে খসে পড়েছে — আর একটা স্তম্ভ অবিকৃত দাঁড়িয়ে আছে তার অসংখ্য কারুকার্য আর সিংহের থাবা নিয়ে।" "আমলা কর্মচারীদের ছোট ছোট ঘরওয়ালা

একতলা মহলটা এদিক ওদিক খোলা হাঁ হাঁ করছে, ... 'তোষাখানা' 'মালখানা' 'নজর-ঘর' ইত্যাদি অসংখ্য মহল, বালির আস্তর ঘুচিয়ে কপাট হারিয়ে, ছাদ ভেঙ্গে পড়ে আছে অনেক ঝড়-বৃষ্টি শীত-গ্রীষ্মের চিহ্ন বুকে নিয়ে মহাকালের নীরব সাক্ষীর মত।" *(পৃ. ১৬৩ ঐ)*। যৌবনে যে অট্টালিকাটি দৃপ্ত চেহারা নিয়ে বিরাজ করত এবং বসবাসকারীরাও যে ধনে মানে কুলগৌরবে ছিল সমুজ্জ্বল তা এই ভগ্নদশাগ্রস্ত অতিবৃদ্ধ আবাসটি দেখলেই বোধগম্য হয়। আত্মীয়-পরিজন ভৃত্য ও পরিবারের লোকজনদের নিয়ে এই অট্টালিকা একসময় সহস্রদলের মতো শোভা পেত, কিন্তু বর্তমানে তা দলমণ্ডলহীন অবস্থায় একটি মৃণালের ওপর যে নিঃস্ব অবয়ব নিয়ে দণ্ডায়মান তাই যেন প্রতিকায়িত হয়ে উঠেছে। সমস্ত কিছু ভগ্নদশাগ্রস্ত হলেও অন্দরমহলের দু'একটা ঘর যেমন শুধুমাত্র ব্যবহারযোগ্য রয়ে গেছে তেমনি রয়ে গেছে গৃহকর্তা পিনাকপাণির অন্তরের নীল রক্তের আভিজাত্য বোধে।

পরিবারের অর্থকৌলিন্য লুপ্তপ্রায়, কিন্তু অতীতের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে দোতলা বাড়িখানা। 'বহুরূপী' গল্পে পাওয়া যায় এ চিত্র, যেখানে দৈন্যাবস্থা দিনের পর দিন পরিবারটিকে গ্রাস করলেও বাড়ির ছোট ছেলের সিনেমায় নেমে কিছু রোজগারকে পরিবারের পক্ষে অত্যন্ত অপমানের বলে মনে করে। নিজেদের আভিজাত্যের গৌরব ধরে রাখতে দাদারা এই বাড়িখানি থেকে ভাইকে গলাধাক্কা দিয়ে বহিষ্কার করে দেয়।

অজ পাড়াগাঁয়ে পাকা বাড়ি, ধানের গোলাবাড়ির ধ্বংসাবশেষ নিয়ে আর ভগ্ন পরিবারের শেষাংশ নিয়ে 'ছেঁড়া তার' গল্পে বসবাস করছে বিনয় মল্লিক। এখনো গরমকালে ছাদে উঠে হাওয়া লাগিয়ে শরীর শীতল করে। কাকার মেয়ের বিয়ের আগের দিন "আটচালার নীচে গ্যাসের আলো জ্বালিয়া ময়রারা ভিয়ান বসাইয়াছিল আর বাতাসে আসা ঘিয়ের গন্ধ কি অরুচিকরই লাগিতেছিল।" — আষাঢ়ের গুমোট গরমে একথা বিনয় মল্লিকের আজো মনে পড়ে। পরিবারের সমৃদ্ধির স্মৃতি রোমন্থন করেই দিনগুলো ক্রমশঃ এগোতে থাকে।

একান্নবর্তী সংসারে প্রচুর লোকজনের মাঝে তিনতলা বাড়িও একসময় অকুলান হয়ে ওঠে। 'একরাত্রি' গল্পে দেখা যায় সেই চিত্র — "একতলা আর দোতলা মিলিয়ে যে সংসার জগদ্দল পাথরের মতো জেঁকে বসেছে মানুষের বুকে ..."

"ছোট্ট ঘরের লাগোয়া মস্ত ছাদটার এককোণে ইজিচেয়ার পেতে ..." "তিনতলায় আজ উঠিসনে তুই, ঘুন্টি শোবে ওঘরে।" *(পৃ. ৩৩৪, ২য় খণ্ড)*। বিশালাকায় একখানি বাড়িতেও বাড়ির যুবক একখানা নিজস্ব ঘর পায় না, প্রয়োজনেই তাকে সেটা ছেড়ে দিয়ে অন্য কারো ঘরে 'ওড়ের নাগরি' বাসা হয়ে রাত কাটাতে হয়। পরিবারের অর্থকৌলিন্যে ঘর আর না বাড়লেও বংশ কৌলিন্যে মনুষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে এই সমস্যা আরো জটিলাকার ধারণ করবে।

'উদ্বাস্তু' ও 'সিঁড়ি' গল্পে পূর্বপুরুষদের তৈরি করে যাওয়া বাড়ির উল্লেখ রয়েছে। সংসারের

স্বচ্ছলতা আনার জন্যে দোতলায় নিজেরা থেকে নীচের তলা ভাড়া দিতে চায়। — "বসত বাড়ীর আধখানাই ভাড়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম বটে, করিয়াছিলাম — সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক কারণেই।... বড়লোক নই, দু'পাঁচখানা বাড়ীও নাই সত্যি, কিন্তু বাড়ীটা বেশ বড়ই।" — *(পৃ. ২৭, ৩য় খণ্ড)*।

'সিঁড়ি' গল্পেও কথকের মুখে শোনা যায় — "বাড়ীটা নিজস্ব বটে — কিন্তু ওই বৃহৎ বাড়ীখানায় থাকা তো সম্ভব নয়?" *(পৃ. ৮৪, — ঐ)*। এখানেও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে বৃহৎ বাড়িটার মতো করেই। এই বাড়িতে জনঅরণ্য নেই কিন্তু যে অট্টালিকা পরিবারের সুসময়ে নির্মিত হয়েছিল, সে সময়টা কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

'পদাতিক' গল্পেও জীর্ণ-শীর্ণ-বর্ণহীন একখানি দ্বিতল অট্টালিকা রয়েছে, যা দেখলে পরিবারের ঐতিহ্য কোন পথে অগ্রসর হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়। বিজনবাবু ও তার বড় মেয়ে জয়ন্তী অনেক খেটেখুটে সংসারে অর্থের জোগান দেয় কিন্তু বহুসন্তান পরিবেষ্টিত সংসারে আয়ের তুলনায় ব্যয় অত্যধিক হওয়ায় ঘরবাড়ির সংস্কারের কথা আসতেই পারে না যেন। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে অথর্ব হয়ে যাওয়া গিন্নী — " আর — পায়ে হেঁটে নিচের তলায় নামবেন না।" *(পৃ. ১৫৩, ঐ)* — প্রমাণ করে এই সংসার হয়তো বাড়িটার মতোই ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের দিকে অগ্রসর হবে। পিতৃপুরুষের ভিটের রহস্য সন্ধানে এসেছেন 'একটি ভাঙাচোরা গল্প'র লেখক। তিনি তার মা-বাবা, ঠাকুরদা-ঠাকুমা কাউকেই দেখেন নি কিন্তু আজন্ম সঞ্চিত রয়েছে সেই ভিটে দেখবার ইচ্ছা। কথক যেমন কোন আপনজনকেই দেখতে পাননি তেমনি দেখতে পাননি সেই বিশাল বাড়ির পূর্ণাবয়ব। পুনরুদ্ধারের জন্যে নয়, শুধু দেখবার জন্য যাওয়া যেমন নিজের আত্মার আত্মীয় কেউ নেই, যাকে পুনরুদ্ধার করে আনা যায়।

— "যদি জানা যাইত কেমন দেখিতেছিল এই বিরাট অট্টালিকাখানা, কেমন তরো ছিল ইহার বাসিন্দারা।" ...

— "আগাছার ফাঁকে ফাঁকে কোথাও খাড়া হইয়া আছে — একটা দালানের আধখানা খিলান, কোথাও মাথা জাগাইয়া আছে চওড়া চওড়া কয়েকটা সিঁড়ির ধাপ, কোনখানে বা ঘরের সামান্যতম ভগ্নাংশ।"

— "এতবড়ো দোতলাখানা ধুলিসাৎ হইয়া গিয়াছে, অথচ একতলার রান্নাঘরখানা দিব্যি দাঁড়াইয়া আছে প্রায় অবিকৃত অবস্থায় কেবলমাত্র মাথাটা হারাইয়া। দেয়ালের গায়ে এখনো স্পষ্ট ফুটিয়া আছে ধোঁয়ার কালিঝুলি, কুলুঙ্গির উপর মাকড়সার জালের পিছন হইতে উঁকি মারিতেছে একখানা মাটির মালসা, মেজেয় সারি সারি কয়েকটা উনুনের আদরা।..."

পাড়ার কবিরাজ মশাই — "আন্দাজে আন্দাজে পরিচয় করাইয়া দেন কোথায় ছিল ঠাকুর দালান, কোথায় বৈঠকখানা, কোন্‌খানে বা অন্তঃপুরের সীমানা।" *(পৃ. ২৭৩, — ঐ)*। ধ্বংসপ্রাপ্ত

অট্টালিকাই সংকেত দিচ্ছে ধ্বংসোন্মুখ পরিবারটিও খণ্ডিত অবস্থায় কোনক্রমে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলছে।

'কসাই' গল্পে রয়েছে একান্নবর্তী পরিবার, যেখানে পরিবারের প্রত্যেককে ধারণ করে রয়েছে 'তিনতলা' বাড়িটি। ভাইয়েরা প্রত্যেকে কোনরকমে চাকরি বাকরি করে এবং বৌ-ঝি-বিধবা বোন এরা সকলে সম্মিলিতভাবে গৃহকর্মাদি পরিচালনা করে দিনাতিপাত করছে। ঠাকুর, চাকর আজ আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। — "বিধবা ননদ সেইমাত্র ঠাকুরঘর থেকে নেমে আসেন।" — "মরীয়া হয়ে ক্রন্দনরত ছেলেটাকে টানতে টানতে উঠে যায় কমলা তিনতলার ছাদে।" *(পৃ. ৮৩, পঞ্চম খণ্ড)*।

"ভর সন্ধ্যেবেলা ছেলের চিৎকারে পুজোপাঠ মাথায় উঠলো গা? কি ছেলেই জন্মেছে! অমন ছেলেকে নুন খাইয়ে মারতে হয়।" *(পৃ. ৮৩, ঐ)*। পরিবারের মধ্যে যে ভাঙন ধরেছে তা এই ধরনের আরো সব উক্তি থেকেই বোঝা যায়। অর্থনৈতিক অবস্থা, পারস্পরিক সম্পর্কের হৃদ্যতা ও আন্তরিকতা যেমন অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে তেমনি বংশ গৌরব বৃদ্ধিকারী তিনতলা বাড়িটিও ক্রমাগত ধ্বংসের মুখে নিজেকে সমর্পণ করছে। বাড়ি এবং পরিবার দুটোই যেন ভেঙ্গে পড়ার পূর্বে কোনরকমে আঁকড়ে বেঁচে থাকতে চাইছে।

'মণিকোঠা' গল্পে সুনন্দা ও সীতেশের একটিমাত্র সন্তানকে দুটো ভালো শার্ট পর্যন্ত পরাতে পারে না অথচ তারা বসবাস করে একটি দ্বিতল বাড়িতে। কিন্তু বাড়িখানার চেহারাও তেমনি — "সরু ইটপাতা সিঁড়ি! ভাঙাভাঙা এবড়ো খেবড়ো।"

— "যেমন ভাঙা ঝরঝরে ... তাও যা দাদাশ্বশুরের আমলের একটু আস্তানা ছিলো, তাই — রাস্তায় দাঁড়াতে হচ্ছে না। নীচের ঘরখানা ভাড়া দিয়েও দু'পাঁচ টাকা আসছে।" যারা নিজের একমাত্র সন্তানকে বেঁচে থাকবার ন্যূনতম অন্ন বস্ত্র ব্যতীত কিছু দিতে পারেন না তাদের পক্ষে তো বাড়িকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা সম্ভবপর নয়। তাই পরিবারের সদস্য সংখ্যা নিতান্ত কম হলেও তারা যেমন অর্থনৈতিক দুর্দশাগ্রস্ততার ভারে নিমজ্জিত তেমনি তাদের এককালের আনন্দ নিকেতন এই বাসভবনটিও দীনহীন অবস্থায় জর্জরিত। যে কোন সময়েই মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে পারে হুড়মুড় করে।

অখণ্ড পরিবারগুলো খণ্ড খণ্ড হয়ে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে নতুন করে ভিত্তির সন্ধান করতে চাইছে। এর মূলে রয়েছে আত্মসুখের প্রবণতা। এই স্থূল বোধগুলোই অতীতের আভিজাত্যবোধকে ভেঙ্গে দিচ্ছে। তারই নিদর্শন মেলে 'স্বাধীনতার সুখ' গল্পে।

— "এখন উজ্জ্বলা স্বাধীন হয়েছে। সাবেক বাড়ি থেকে চলে এসে এ পাড়ায় বাড়ি কিনে বাস করছে আর সেই অবধি যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে চঞ্চলা।" *(পৃ. ৩০২, ৩য় খণ্ড)*। প্রাচীনের মধ্যে যে পারিবারিক ঐতিহ্য, প্রথা, রীতি-নীতি রয়েছে তাকে পরিত্যাগ করে আত্মসুখ চরিতার্থতার যে

বিলাস — তাকে প্রাধান্য দিতেই সাবেকি বাড়ি, একান্নবর্তী পরিবার গৌণ হয়ে উঠেছিল। শুধু উজ্জ্বলাই গণ্ডী ছেড়ে বেরিয়ে আসেনি, ছোটবোন চঞ্চলাকেও ইন্ধন যোগোচ্ছে যাতে করে নিজের স্বাধীন জীবনের সন্ধানে অচিরেই এই বিরাট বাড়ি আর বিরাট পরিবার পরিত্যাগ করে যায়।

"এই তো দেখলাম — সেদিন, খালি গায়ে নীচের দালানে ঠাণ্ডায় বসে তোর জায়ের মেজো ছেলের সঙ্গে রুটি খাচ্ছে! মাগো! অমন দুঃখচেটে করে ছেলেপিলে মানুষ করে শত জন্মে দেখতে পারিনে। আমার বুকু বিজ্জ অতো বড়ো ছেলে এখনো রুটি কি জিনিস তা জানে না। যা' করে ওই লুচি সন্দেশ!" *(পৃ. ৩০৫, ঐ)*। মনের দুর্বল স্থানে আঘাত দিয়ে দিয়ে অখণ্ডতার বিনষ্টি ঘটিয়ে তাকে খণ্ড খণ্ড করে ছড়িয়ে ফেলার মধ্যেই যেন সুখ লুক্কায়িত রয়েছে। আর তাই নিজস্ব সম্পদকে, নিজের বাড়িকে আবার নতুন করে সাজিয়ে তুলে পরিবারের ঐতিহ্যকে রক্ষা করার পরিবর্তে তাকে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার প্রতীক হিসেবেই যেন আশাপূর্ণা দেবী অধিকাংশ গল্পেই ভগ্নদশা অট্টালিকাগুলোর ক্রমাবনতিকে তুলে ধরেছেন।

"দালানের মাঝখানে গালচের আসন পেতে গোটা আষ্টেক দশ বাটি আর অভব্য রকমের বড় একখানা থালা সাজিয়ে আহারের আয়োজন করা হয়েছে। জামাইয়ের নয়, বেহাইয়ের।" *(পৃ. ৩২৩ — ঐ)*।

'অভিনেত্রী' গল্পে যখন বিশাল বনেদী বাড়ির জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থা ছিল তখনকার এই চিত্র। আর তার থেকে পঁচিশ বছর পরেই প্রস্ফুটিত হয় পূর্বের চিত্রের ক্রমাবনতি। "কালের পরিবর্তন হয়েছে বটে — স্থানটা ঠিক আছে। 'পাত্র' টাও বলা চলে। সেই দালানে — ঠিক সেই জায়গাতেই সেই ভঙ্গীতে বসে আছেন গৃহিণী অনুপমা, ... আসনটা আর বাসনগুলো বাপের আমলের, তবে আহার আয়োজনটা নয়। তা'তে এ যুগের শীর্ণ ছাপ! অনুরোধ-উপরোধের কাজটা ফুরিয়েছে গৃহিণীদের।... সংসারের এই নবাবীচাল চেলে আর কতদিন চালাতে পারবেন তারকনাথ?" *(পৃ. ৩২৬, — ঐ)*।

'রাহু' গল্পেও দেখা যায় যথেষ্ট বড় অট্টালিকা রয়েছে। বাড়িতে প্রয়োজনের তুলনায় ভৃত্যের সংখ্যাও অতি নগণ্য। সংসারের রথচক্র স্বাভাবিকভাবে ঘূর্ণায়মান হলেও সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কর্তারা সংসারের পরিচালনাতেই ব্যস্ত, ঘরবাড়ির দিকে নজর দেবার ঔৎসুক্য যেন নেই। "কই রে রতন, বড় সুটকেস্‌টা কি করলি? দোতলায় তুলে দিয়েছিস্‌?" *(পৃ. ১১৫, গল্প সমগ্র ২য় খণ্ড)*। "এ বাড়ির বড়বৌ কল্পনাই শুধু ছুটে আসে নি ব্যস্ত হয়ে, ছাদে বসে বড়ি দিচ্ছিল নাকি কে জানে।" *(পৃ. ১১৬, ঐ)*। "নীচের গোলমাল তার কানে এসেছে, আলসে থেকে ঝুঁকে ব্যাপারটা বুঝে নেওয়ার পর আর নীচে নামবার গা নেই তার।" *(পৃ. ঐ — ঐ)*। এ ধরনের আরো নানা উক্তিতে রয়েছে বহুতল বাড়ির প্রমাণ।

'পদ্মলতার স্বপ্ন' গল্পেও দেখা যায় দ্বিতল অট্টালিকাখানা। "যদু লাহিড়ীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির 'বোলবোলাও' ঘুচিয়াছিল।' *(পৃ. ১২৩ — গল্প সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড)*। "প্রদীপের লোভ দেখাইয়া এক আধদিন মেয়েকে বিছানায় শোয়াইয়া আসিলেই দোতলার জানলা হইতে লাহিড়ী গিন্নীর ভাঙাভাঙা বিরক্ত কণ্ঠের আওয়াজ আসে।" *(পৃ. ১২৫ — ঐ)* এবং "তাছাড়া পৃথিবীর সমস্ত ভূত-প্রেত দৈত্য-দানব কি দল বাঁধিয়া জমাট হইয়া নাই — সেই বালির আস্তরণ খসা হাড়পাঁজরা বার করা ঘরখানার ছম্‌ছমে কোণে কোণে?" *(পৃ. ১২৪ — ঐ)*। বাড়িটি দোতলা হলেও তার ভেতরের চেহারাটা ধরা পড়ে উপরোক্ত উক্তিতে। অনেক কাল পূর্বের অট্টালিকাটাই শুধু রয়ে গিয়েছে ভেতরটা একেবারে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে।

'ছিন্নমস্তা' গল্পে মূল চরিত্রে রয়েছে বিধবা শাশুড়ি জয়াবতী, পুত্রবধূ প্রতিভা এবং পুত্র বিমলেন্দু। বিমলেন্দু ভালো ছাত্র এবং চাকরিও করে, কিন্তু পিতৃপুরুষের ভিটেতে যে বসত বাড়ি রয়েছে তার প্রতি কোন যত্ন নিতে বা অভিনবত্ব আনবার নিমিত্ত কোন ভাবনাচিন্তাও করতে দেখা যায় না। অর্থাৎ পূর্ব নির্মিত অবস্থাতেই রয়ে গিয়েছে। "রাত্রি দশটায় জয়াবতী যখন বিরক্তি তিক্ত কণ্ঠে আহারের জন্য ডাক দেন, তখন নামিয়া আসে বিমলেন্দু, চুপ করিয়া খাইয়া উঠিয়া যায়।" — *(পৃ. ১৬৫, আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প সঙ্কলন)*। "শাশুড়ি চরিত আলোচনান্তে পড়ন্ত বেলায় উঠিয়া চুল বাঁধে, গা ধোয়, পরিপাটি করিয়া সাজিয়া ছাদে গিয়া বসে, নয় তো বরকে চিঠি লেখো।" *(পৃ. ১৬৭, ঐ)*। "আর এ তো শানবাঁধানো উঠান" — "দালান ঝাঁট দিতে দিতে কথাটা কানে গেল জয়াবতীর।" সংসারে শেষ পর্যন্ত বিধবা শাশুড়ি ও বিধবা পুত্রবধূ থেকে গেল, বিমলেন্দু অ্যাকসিডেন্টে মারা গেলে আয়ের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং নতুন করে বাড়ির দিকে নজর দেবার কোন অবকাশই নেই। সংসারের তিনটি সদস্যের মধ্যেও যে ভাঙন দেখা দিয়েছিল, শাশুড়ি পুত্রবধূ এক সংসারে তৃপ্ত নন। শুধু একান্নবর্তী পরিবার নয়, ছোট পরিবারেও মানিয়ে নেবার যে প্রবণতা তা নিঃশেষ হয়ে আসছিল, যেমন নিঃশেষের পথে অগ্রসর হচ্ছিল বয়সের দিনে এগিয়ে চলা অট্টালিকাগুলো।

'একরাত্রি' (১৩৫৪) গল্পেও তিনতলার একটি বাড়ির বর্ণনা রয়েছে। যেখানে অট্টালিকার অবস্থান থাকলেও নীচের তলায় গুড়ের নাগ্‌রির মতো ঠাসাঠাসি করে শুতে হয়, যদি বাড়িতে কোন আত্মীয় বেড়াতে আসে। "ছোট্ট ঘরের লাগোয়া মস্ত ছাদটার এক কোণে ইজি চেয়ার পেতে শুয়ে তারা ভরা আকাশের ..." *(পৃ. ৩৩৪, গল্প সমগ্র ২য় খণ্ড)*। — উক্তিটি থেকে বোধগম্য হয় মস্ত ছাদওয়ালা বাড়িটিও বেশ মস্তই। তথাপি এ বাড়িতে ঘরে অকুলান হয়ে থাকে — "একতলা আর দোতলা মিলিয়ে যে সংসার জগদ্দল পাথরের মতো জেঁকে বসেছে মানুষের বুকে, ..." *(পৃ. ৩৩৪, ঐ)*। একমাত্র তিনতলাতেই একটা বেওয়ারিশ ঘর মেলে, যেটায় বাড়িরই এক যুবক সদস্য অশোক

করেছেন। আর যেখানে আবশ্যকভাবেই মাঝে মাঝে প্রবাদ প্রবচন রীতির ব্যবহার হোত সুযোগ্যভাবে। সংগৃহীত বাক্যগুলো যথাসম্ভব নিম্নে উল্লেখ করা হল।

প্রবাদ বাক্য	পৃষ্ঠা	গ্রন্থ	গল্প
"চোরের মন বোঁচকার দিকে"	পৃ. ১১	গল্প সমগ্র (১ম খণ্ড)	'রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা' (১৩৪৪)
"যত হাসি তত কান্না"	পৃ. ১১	"	"
"উচ্চহাসি সর্বনাশী"	পৃ. ২৭	"	'রাজুর মা' (১৩৪৪)
"কিসের সঙ্গে কি পান্তা ভাতে ঘি"	পৃ. ৪৬	"	'মেকী টাকা'
"ভগবানের মার দুনিয়ার বার"	পৃ. ৯৩	"	'জল আর আগুন' (১৩৪৪)
"জন্ম গেল ছেলে খেয়ে / আজ বলছে ডান"	পৃ. ১২৫	"	'ব্যবধান' (১৩৪৪-৪৭)
"সোনার অঙ্গে দিলে সোনা তবেই সোনা অতুলনা"	পৃ. ১৯৮	"	'বিড়ম্বনা' (১৩৪৪-৪৭)
"সর্বস্ব খুইয়ে পাকা টেঁকশাল"	পৃ. ২১৮	"	'মনের গহনে' (১৩৪৪-৪৭)
"বিধি যখন মাপান উপরো উপরি চাপান"	পৃ. ৩৭২	"	'কপালে নাইকো ঘি' (১৩৫০)
"কাঙালের বাড়া বেহায়া নেই"	পৃ. ৩৯১	"	'না' (১৩৫২)
"যে এল চষে সে রইল বসে"	পৃ. ৩১	গল্প সমগ্র (২য় খণ্ড)	'গলায় দড়ি' (১৩৫২)
"পদ্মফুলে ভোমরা ভোলে / খোঁপায় ভোলে বর"	পৃ. ৯৬	"	'সত্যাসত্য' (১৩৫৩)
"ধনবানে কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে"	পৃ. ১১৮	"	'রাহু' (১৩৫৩)
"বামুনের ভাতে আছি, বালামের দর জানি না"	পৃ. ১২৫	"	'পদ্মলতার স্বপ্ন'

প্রবাদ বাক্য	পৃষ্ঠা	গ্রন্থ	গল্প
“মরার বাড়া গাল নেই”	পৃ. ১৫৮	গল্প সমগ্র (২য় খণ্ড)	‘স্বপ্নভঙ্গ’ (১৩৫৩)
“আত্মা রেখে ধর্ম্ম তবে অন্য কর্ম্ম”	পৃ. ১৯১	”	‘একাঙ্কিকা’ (১৩৫৩)
“ষাড়ের শত্রু বাঘে মারে”	পৃ. ১৯১	”	‘একাঙ্কিকা’ (১৩৫৩)
“ঘরে ঘটি ঝক্‌মক্ করে, আলনায় কাপড় ঝলমল করে, গোয়ালে গরু মাইয়ে ধান, মনে সুখ মুখে পান।” (মেয়েলি ব্রতকথার কথা)	পৃ. ২০৩	”	‘যথাপূর্ব্বং’ (১৩৫৩)
“কার শ্রাদ্ধ কে করে / খোলা কেটে বামুন মরে”	পৃ. ৫৯	”	‘লালশাড়ি’ (১৩৫২)
“বাড়া ভাত বেড়ালে ডিঙাতে পারে না”	পৃ. ১৯৯	”	‘আফিং’ (১৩৫৩)
“কাঙালের হয়েছে ঘটি জল খেয়ে মলো বেটি।”	পৃ. ২০৮	”	‘আফিং’ (১৩৫৩)
“গাছে না উঠতেই এক কাঁদি”	পৃ. ৩৩৮	”	‘একরাত্রি’ (১৩৫৪)
“বেহায়ার নাহি লাজ নাহি অপমান, সুজনের এককথা মরণ সমান।”	পৃ. ৩৪৯	”	‘বাজে খরচ’ (১৩৫৪)
“এককান কাটা পথের ধার ঘেষিয়া চলিলেও দুইকান কাটা মাঝখান দিয়াই চলে”	পৃ. ৩৫০	”	‘বাজে খরচ’ (১৩৫৪)
“ঝাড় ঝাড় উচ্ছের ঝাড় ফল পাতা একই তার।”	পৃ. ২২৮	গল্প সমগ্র (৩য় খণ্ড)	‘পাকাঘর’ (১৩৫৮)
“জন্মে দিলে না ভাত-কাপড় মরলে করবে দানসাগর”	পৃ. ২৩৮	”	‘স্খালন’ (১৩৫৮)

প্রবাদ বাক্য	পৃষ্ঠা	গ্রন্থ	গল্প
“কলাপাতে না এগোতে গ্রন্থ লেখা সাধ”	পৃ. ৩১৩	গল্প সমগ্র (৩য় খণ্ড)	‘নীলকণ্ঠ’ (১৩৫৮)
“মরদকা বাত হাতীকা দাঁত”	পৃ. ৩২৫	”	‘অভিনেত্রী’ (১৩৫৮)
“কালের বাড়া চিকিৎসক নাই”	পৃ. ৩৬৪	”	‘ভয়’ (১৩৫১)
“পড়লো কথা সভার মাঝে, / যার কথা তার গায়ে বাজে!”	পৃ. ৩৪	গল্প সমগ্র (৪র্থ খণ্ড)	‘পাখীর বাসা’ (১৩৫৯)
“শুনলো সাড়া কি নিলো পাড়া”	পৃ. ৭০	”	‘ভগবান আছেন’ (১৩৬১)
“হাতি ঘোড়া গেলো তল, ব্যাঙ বলে কত জল!”	পৃ. ১৭৭	”	‘যা নয় তাই’ (১৩৬২)
“যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়।”	পৃ. ১৭৯	”	”
“চাঁদের ওপর চূড়ো!”	পৃ. ১৭৯	”	”
“মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা”	পৃ. ৩১২	”	‘নির্ভেজাল’ (১৩৬৩)
“ঘর থাকতে বাবুই ভিজে?”	পৃ. ৩১৯	”	‘অন্তরালে’ (১৩৬৩)
“ভাইয়ের ভাত ভাজের হাত”	পৃ. ৩৫৪	”	‘ঐশ্বর্য’ (১৩৫৯)
“বলা মুখ আর চলা পা”	পৃ. ২২	গল্প সমগ্র (৫ম খণ্ড)	‘আগুন নিয়ে’
“যেমন দান তেমন দক্ষিণা। যেমন বিয়ে, তার তেমনি আলতা।”	পৃ. ৩৭	”	‘পুরুষ সিংহ’
“ধান হলাম না আগরা হলাম কুলোর আগায় নেচে মলাম”	পৃ. ৬৯	”	‘স্বপ্নশবরী’
“যার নাম চালভাজা তার নামই মুড়ি।”	পৃ. ১৩৪	”	‘মন্টি’

প্রবাদ বাক্য	পৃষ্ঠা	গ্রন্থ	গল্প
"কটা মেজাজ চটা"	পৃ. ২০৮	গল্প সমগ্র (৫ম খণ্ড)	'নিঃসম্বল'
"আমড়া গাছে কি আর ন্যাঙড়া ফলবে?"	পৃ. ২০৬	"	'নিঃসম্বল'
"যে-ই রক্ষক সে-ই ভক্ষক"	পৃ. ২৭৬	"	'মোড়'
"স্ত্রী ভাগ্যে ধন"	পৃ. ৩৯১	"	'এক যে রাজা'
"অতি ঘরন্তি না পায় ঘর"	পৃ. ৬১	নির্বাচিত আশাপূর্ণা	'নদীর চরে'
"হাতী যখন হাবড়ে পড়ে ব্যাঙে ধরে লাথি মারে।"	পৃ. ৯৭	"	'অসতর্ক সবাই'
"চোরের সাতদিন সাধুর একদিন।"	পৃ. ৩৭	স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠগল্প	'নিরাশ্রয়'
"ছেলে হাঁকে এপারে মা কাঁদে ওপারে।"	পৃ. ৮২	"	'পত্রাবরণ'
"ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো"	পৃ. ৮৭	"	'যা হয় তাই'

সমাজে সমস্ত স্তরের মানুষের মধ্যেই ভালো-মন্দের সংমিশ্রণ দৃষ্টিগোচর হয়। প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার সাধারণতঃ মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি গুলোকেই তুলে ধরতে চায়। প্রবাদ ব্যবহারের সময় ভ্রান্তিগুলো তুলে ধরার অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হলেও ভ্রম সংশোধিত করে সঠিক স্থানে ফিরিয়ে আনাই আসল উদ্দেশ্য থাকে। উপরোক্ত প্রবাদগুলো ব্যবহারের সময়ও লেখিকা একই উদ্দেশ্য বজায় রেখেছেন। প্রবাদ প্রবচনের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে বৈচিত্র্য রয়েছে। যেমন-ঈশ্বরের অস্তিত্বের ওপর বিশ্বাসের ফলে নিয়তির প্রতি বা কর্মফলের প্রতি যে আস্থা জন্মায় তার কথাই বলা হয়েছে 'ভগবানের মার / দুনিয়ার বার' প্রবাদটিতে। অর্থাৎ মানুষের যুক্তি-প্রচেষ্টা যেখানে পরাভূত হয়। আবার নারীদিগের সৌন্দর্য চেতনা, রূপচর্চার সঙ্গে নিবিড় সখ্যতার নিদর্শন মেলে — 'পদ্মফুলে ভোমরা ভোলে / খোঁপায় ভোলে বর।' — যে খোঁপা আজ ব্যস্ততার যুগে সৌন্দর্যের জগত থেকে নির্বাসিত তাই-ই স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য ব্যবহৃত হোত। কারণ তখনকার নারীদের জগত বলতেই তো ছিল অন্দরমহলের পরিধি, অভ্যস্ত জীবনের প্রবাহ আর সম্পন্ন গৃহস্থ ঘরের নারীদের প্রসাধনী সামগ্রীর দ্বারা চর্চিত করে নিজেকে পটেশ্বরী করে সজ্জিত করে রাখা। আবার সৌন্দর্য্য চেতনার

পরিমিতি বোধ থেকে জন্মায় অলংকার ব্যবহারের নৈপুণ্য। যিনি ভূষণের দ্বারা বিভূষিতা হবেন, তিনি যদি যথার্থ অর্থেই রূপবতী হন তবে তো এধরনের প্রবাদই ব্যবহৃত হতে পারে — "সোনার অঙ্গে দিলে সোনা / তবেই সোনা অতুলনা।' এ প্রবাদটি আশাপূর্ণা দেবী একটি পুরুষ চরিত্রের মুখে ব্যবহার করেছেন যিনি পেশায় স্বর্ণালঙ্কার নির্মাতা। তার মধ্যে রয়েছে সৌন্দর্য্যবোধ, যিনি জানেন সোনার হাতেই সোনার কাঁকন শোভা পায়। 'অতি ঘরনি না পায় ঘর' — অধিকমাত্রায় সংসার সম্পর্কে সচেতন যে নারী, সংসার পরিচালনায় অসম্ভব দক্ষতা যার রয়েছে হয়তো সেই বাল্যকালে বিধবা হয়ে অন্যের সংসারে আশ্রিতা হয়ে দিনাতিপাত করছে। 'নদীর চরে' গল্পের সুনীলা বালবিধবা হয়ে পিতৃগৃহেই অবস্থান করছে, তবে একাকী। আত্মীয় পরিজনের মধ্যে যখনই যার বিপদে প্রয়োজন পড়ে তখনই এই একাকিনী আত্মীয়া সুনীলার কথা মনে পড়ে। সুনীলাও জীবনে সংসারের স্বাদ পায়নি, কিন্তু সাধারণ নারীদের মতোই সংসারের সাধ মনে পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। যখনই যে সংসারে যায়, তাকে আপন ভেবে বুকে তুলে নেয়। কিন্তু সবচেয়ে সাধ মিটিয়ে করেছে উক্ত গল্পের নীলেন্দু সুজাতার সংসার, যেখানে সুজাতা কঠিন রোগশয্যায় শায়িতা। সুনীলা যেন এই সংসারে এসে হাতে স্বর্গ পেল। সমস্ত ভার তার হাতে, কর্ত্রীর আসনে পূর্ণমাত্রায় অধিষ্ঠিতা হয়ে এতটাই নৈপুণ্যের সঙ্গে একা হাতে সব সামলাচ্ছেন দেখে সুজাতার সেবাকারিণী নার্স একথা বলেছিল।

'যে এলো চষে / সে রইল বসে' — প্রবাদটিতে সুন্দরভাবে বিবৃত করা হয়েছে তার কথা — যে পরিশ্রম করে পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় গৃহে ফিরে তাকেও বসে থাকতে হয়। তার উপস্থিতি তার সমস্যাটা অন্যান্যদের দৃষ্টির অগোচরে চলে যায়। 'গলায় দড়ি' গল্পে সত্যজিৎ তিরিশ বছরে বিবাহ করেছে, সে দিল্লীতে থাকে। তার নব পরিণীতা কতদিন পিতৃগৃহে থাকবে আর কতদিন শ্বশুর গৃহে থাকবে তা নিয়ে সকলেই আলোচনায় মত্ত কিন্তু যে বিবাহ করেছে, যে স্বামী তার নিকট কখন যাবে সে বিষয়ে কোন বক্তব্য কারো না থাকায় সত্যজিতের পিসি একথা বলেছিল। 'কাঙালের হয়েছে ঘটি / জল খেয়ে ম'লো বেটি' — মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক দুরবস্থার আঁধার কেটে যখন সুখের সূর্য উদিত হয় তখন নতুন করে সুখের বিলাস ব্যসনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে গিয়ে অনেকেই দিক্‌ভ্রান্ত হন। সেই অবস্থা থেকেই এ ধরনের প্রবাদটির জন্ম 'কলাপাতে না এগোতে / গ্রন্থ লেখা সাধ' — লেখা শিক্ষাকালেই যদি কারো গ্রন্থ রচনা করতে উৎসাহ জাগে — সে ধরনের ব্যক্তির কথাই বলা হচ্ছে। অর্থাৎ লেখা সম্পর্কে শিক্ষালাভ আর গ্রন্থরচনা — দুটোর মধ্যে যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে, এই বোধহীনতা থেকেই প্রবাদটির জন্ম।

'নীলকণ্ঠ' গল্পে যখন কাকাকে বলেছিল মাংস, মশলা, আদা, আলু কিনে রেখে যেতে সে রান্না করবে যত্ন সহকারে। তখন তার কাকা অত্যন্ত ব্যঙ্গ মিশ্রিত সুরে ভাত সেদ্ধ করতে না পারার অভিযোগ উত্থাপন করে উপরোক্ত প্রবাদটি ব্যবহার করেছিল। 'মরদকা বাত / হাতিকা দাঁত' —

হাতির দাঁত যেমন দামী তেমনি সত্যকার ভদ্র ব্যক্তি যিনি তার কথাও তেমনই দামী, একথার তাৎপর্য বোঝাতেই উক্ত প্রবাদটি গঠিত। এভাবে আরো অনেক প্রবাদকে আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পগুলোতে সুপ্রযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পেরেছেন। চরিত্রগুলো সপ্রতিভ এবং সুস্পষ্ট হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে এই প্রবচন রীতির সংযোজন বেশ সহায়ক হয়ে উঠেছে।

চরিত্র ঃ

সাহিত্যাঙ্গনের যে কোন শাখাতেই অর্থাৎ গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতিতে চরিত্র একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কারণ ঘটনা যাই হোক না কেন তা প্রকাশিত হবে চরিত্রেরই সাহায্যে; আবার ভাষা ও সংলাপের সার্থকতাও নির্ভর করে চরিত্রের বিকাশের ওপর। সুতরাং কাহিনির গঠন, রীতি, ঘাত-প্রতিঘাত, সংলাপ, ভাষা — সমস্ত কিছুকেই চরিত্র তার নিজস্ব ছন্দের তালে বহন করে নিয়ে চলে। চরিত্র মানবিক উপাদানের প্রয়োজন হিসেবেই কাহিনিতে উপবিষ্ট হয়। ছোটগল্পের পরিসর থাকে ছোট, তার মধ্যে চরিত্রের সমস্ত দিকগুলো দেখানো সম্ভব হয়ে ওঠে না। ছোটগল্পের কাহিনি একটি বৃহৎ জীবনের খণ্ডচিত্র, সেই সঙ্গে সাজুয্য রেখে চরিত্রের বিকাশ বা রূপান্তর ঘটে। লেখক বা লেখিকা তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে যে আদর্শ সঞ্চারিত করতে চান তার ধারকই হচ্ছে চরিত্র। তাই সেই আদর্শবোধ এবং চরিত্র একে অপরের সঙ্গে মিশে গিয়ে এক বিশেষ শিল্প নৈপুণ্যের বিকাশ ঘটায়।

আশাপূর্ণা দেবী যেহেতু মনেপ্রাণে অত্যন্ত ঘরোয়া এবং সামাজিক, তাই তাঁর রচনায় সমাজ একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। তিনি সমাজে গৃহের অভ্যন্তরে অন্দরমহলে যা দেখতেন তাকে মর্মে মর্মে অনুভব করতেন। আর সেই বহু দৃশ্যমান জীবনের ঘটনাগুলো থেকেই তার মনে একটা আদর্শ জন্মলাভ করে। এই দৃশ্যমান জগত থেকেই চরিত্রগুলোও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকাশ লাভ করে। এভাবেই চরিত্রগুলো সমাজের সঙ্গে একাঙ্গী হয়ে সজীব হয়ে উঠতো। সমাজের প্রতিটি অনুশাসনের মধ্যে চরিত্ররা ছিল বিরাজিত, আর তাই সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান একটা সুস্পষ্ট রূপ পেত। আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পে চরিত্রদের অন্তর্বয়ন দেখা যায় না। কারণ অন্তরের গভীর মর্মস্থলে ডুব দিয়ে হৃদয়ের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলো সন্ধান করার মতো জটিলতা বা দ্বন্দ্ব চরিত্রগুলোর মধ্যে প্রকট হয়ে ওঠে নি। নিজের অস্তিত্বকে জানবার ইচ্ছা, নিজের মনের গতিবিধি সম্পর্কে সজাগ হয়ে তার প্রতিটি কার্যকলাপ অবহিত হবার জন্য যে ব্যক্তিত্ববোধের প্রয়োজন, সে ধরনের চরিত্র লেখিকা সৃষ্টি করেন নি। তিনি নারী-পুরুষ উভয় চরিত্রের মধ্যে (বিশেষতঃ নারী) সচেতনতাবোধকে জাগ্রত করলেও তাদের সেই অনুভূতি সমাজজীবনের নানা ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত কর্মেই আবদ্ধ রয়েছে। সমাজ ব্যতিরেকে নিজেকে নিয়ে চিন্তা ভাবনার জাল বিস্তার করার কথা কোন চরিত্র কখনো ভাবে নি। তাই আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্পে চরিত্রগুলো একাত্ম, অন্তর্মুখী হয়ে উঠতে পারে নি। সমাজের বৈষম্য ও

অনাচারের বিরুদ্ধে তিনি বরাবরই জেহাদ ঘোষণা করে গিয়েছেন গল্পের চরিত্রগুলোর মাধ্যমে। সেই থেকে তৈরি হয়েছে বেশ কিছু বিদ্রোহী চরিত্র। এই ধরনের প্রতিবাদে নারীরাই অগ্রবর্তিনী। এতে বোঝা যায় নারীরাও যে ন্যায়-অন্যায় অধিকারবোধ — সবকিছু সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে। যেমন — 'শান্তি' গল্পে 'মহামায়া', 'অনাচার' গল্পে 'সুভাষ কাকীমা', 'পৃথিবী-চিরন্তনী' গল্পে 'পান্টি', 'তাসের ঘর' গল্পে 'মমতা', 'না' গল্পে 'রাজ্যশ্রী', 'সর্পশিশু' গল্পে 'ফেলী', 'বহ্মাস্ত্র' গল্পে 'অসীমা' 'আহতফণা' গল্পে 'পাখী', 'ইজ্জত' গল্পে 'জয়ী', 'অভিনেত্রী' গল্পে 'অনুপমা', 'অঙ্গার' গল্পে 'নতুন বৌদি' প্রভৃতি আরো অনেক নারী চরিত্র। আবার কল্যাণী নারীমূর্তি যে মাতৃত্বের কোমলতায় সিক্ত, তার মধ্যেও তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে বাস্তব সত্যের কঠোর অভিঘাত সজোরে আঘাত করে তাকে কোমলে কঠোরে আত্মসম্মানবোধে এক ব্যক্তিত্বময়ী নারী চরিত্রে রূপান্তরিত করে তুলেছে। তার জ্বলন্ত নিদর্শন পাওয়া যায় 'ছিন্নমস্তা' গল্পে 'জয়াবতী' চরিত্রে। এছাড়া 'ভগবান আছেন' গল্পে 'নিভাননী' 'ঐশ্বর্য' গল্পে 'অপর্ণা' — প্রভৃতি নারীরা আশাপূর্ণার লেখনী প্রসূত এবং সকলেরই উদ্ভব সমাজ থেকেই। উচ্চ-মধ্য-নিম্নবিত্ত সমাজের সর্বত্র তিনি তাঁর লেখনীকে স্পর্শ করালেও তাঁর নিজের ব্যক্তি জীবনের প্রতিবিম্বের প্রতিফলন যে সমাজে দেখেছেন, সেই মধ্যবিত্ত সমাজের চরিত্ররাই তাঁর রচনার প্রায় সর্বাংশ বিস্তার করে রয়েছে। তিনি কিছু কিছু পুরুষ চরিত্রকেও গুরুত্ব দিয়ে রচনা করেছেন। যেমন — 'অভিশপ্ত' গল্পের 'পিণাক পানি চৌধুরী', 'পৌরুষ' গল্পে 'নিতাই', 'আয়োজন' গল্পে 'লোকনাথ', 'কসাই' গল্পে 'সমরেশ' — প্রভৃতি পুরুষ চরিত্ররাও আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে নানাভাবে নিজেদের বিকশিত করে তুলেছে। সমাজের বুকে ঘটে যাওয়া সাধারণ ঘটনাগুলোকে তিনি অত্যন্ত সাধারণভাবে নিপাট গল্প বলার ভঙ্গীতে বলে গিয়েছেন যেসব চরিত্রগুলোর মাধ্যমে তারাও অত্যন্ত সহজ সরলভাবে বিকশিত হয়ে যেন জীবন্ত প্রতীকে মূর্ত হয়ে উঠে উঠেছে। এই চরিত্রগুলোই আশাপূর্ণা দেবীর গল্পের সার্থকতার একটি বিরাট দিক।

ভাষা ঃ

ছোটগল্পের প্রতি পাঠককুলের যে আগ্রহ রয়েছে, তার মূল আকর্ষণ শক্তি হল ভাষা। উপন্যাসে যেমন পূর্বপক্ষ উত্তরপক্ষ রয়েছে এবং রয়েছে জীবনের নানা সংঘাতময় চিত্র, ছোটগল্পে শুধুমাত্র জীবনের স্রোতের মধ্যে থেকে এক টুকরো ঘটনাই প্রধান হয়ে ওঠে। তাই এর ভাষাও হয় অনেক সুনির্বাচিত। স্বল্প পরিসরে দ্বন্দ্ব আঘাত দেখাতে হয় বলে যে কোন শব্দ দিয়েই কাজ সেরে নেওয়া যায় না। অর্থাৎ ভাষার সহজবোধ্যতা, সরলতা, মাধুর্যের স্নিগ্ধতা ও গতিবেগের মধ্যে নিহিত ছন্দ পাঠককে পাঠ্যারম্ভ থেকে পাঠের শেষ পর্যন্ত যে শ্রুতিসুখকর একটা আবেশে জড়িয়ে রাখে তাতেই ভাষা সার্থকতা লাভ করে। এক এক পরিবারের মধ্যে দেশ, কালের যে ছাপ রয়েছে তা ভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। তাকেই সুস্পষ্টরূপে প্রতিকায়িত করতে কখনো কখনো আঞ্চলিক ভাষাও ব্যবহৃত

হয়। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর রচিত গল্প গ্রন্থে সেই সহজ, সরল ভাষাগুলোই ব্যবহার করেছেন। তাঁর রচনার ভাষা আটপৌরে ভাষা। অনেকটাই মেয়েলী ভাষা। তাঁর লেখনীতে মেয়েদের কথাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। তাদের জীবন যাপন, চলাফেরা, কথনরীতি সবটাই ভাষাভঙ্গী বা বাচনভঙ্গীর মধ্য দিয়ে ধরা পড়েছে। আশাপূর্ণা দেবীর ভাষার গতিতে যে সাবলীলতা রয়েছে তা পরিপূর্ণভাবে ঘরোয়া ছবির ক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত। গতিশীল স্রোতময় ভাষা অতি সহজেই মনকে গল্পের অন্তিমে প্রবাহিত করে নিয়ে যায়। আশাপূর্ণা দেবীর ভাষা অলংকৃত নয়। অন্দরমহলের নারীর ভাষাকে যে তিনি কীভাবে আয়ত্ত করে নিতে পেরেছিলেন অজস্র গল্পের নারী চরিত্রের বাচনভঙ্গীতে তা ধরা পড়েছে। যেমন, কিছু নমুনা নিম্নে উল্লিখিত হলো —

আশাপূর্ণার গল্প সমগ্রের প্রথম খণ্ডে 'যে নদী মরুপথে' গল্পে মেজগিন্নী চরিত্রের এক নারী তার 'তুতো' সম্পর্কের দেবরকে বলছে — "এ তোমার অন্যায় আশা ঠাকুরপো — কাটা ডাল কি গাছে জোড়া লাগে? মরে গেলে তো পোড়াতেও আসবে না আমাকে, নিজের অসময় পড়েছে তাই মেজবৌদির খোঁজ। মেজবৌদি ম'ল কি বাঁচলো — খায় কি উপোস দেয় — একখানা পোষ্টকার্ড ফেলে খবর নিয়েছ কখনো? যাক্ তা'র জন্যে আফশোস আমার নেই — তবে বৌ ছেলের রান্না করতে লোকের অভাব হয়েছে বলে তু'করে ডাকলেই ছুটে যাবো — এ কি আর হয়?" *(পৃ. ১৭৪)*।

"ঢের হয়েছে ছোড়দা, শাক দিয়ে আর মাছ ঢেকো না তুমি, এতখানি বয়েস হ'ল, সোনা পেতল চিনি না? ঘাস তো খাই না!" *(পৃ. ১৯৬, বিড়ম্বনা গল্প সমগ্র, প্রথম খণ্ড)*।

"আঃ মর্ মাগী চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করছে' — বামুন ঠাকুরের হেন্‌সেলে দিয়ে আসবি অত বুঝতে পারবে কেন? কেমন যে সব লম্বা নজর, ছেলে-পুলেকে আর খাইয়ে আশ মেটে না — বুঝলি খোকার মা, এ বাড়িতে মুড়ি মিছরির একদর। নে ন্যাজাখানা আরো ছোট কর দিকিন্ — " *(পৃ. ২০১, 'নিগড়' প্রথম খণ্ড)*।

"তোমার সেই বুনঝিকে বোলো ছোট মা; এ একেবারে অব্যর্থ। একটি মাস পেরুতে দেবে না — বললে না পেত্যয় করবে ছোটমা এমনি গুণ; এই শেকড়ের টুকরো নাল সুতো দে গাছের গায়ে বেঁধে দিলে জন্ম বাঁজা গাছে ফল ধরে — তা 'মনিষ্যি কোন ছার।" *(পৃ. ২২২, 'মনের গহনে' প্রথম খণ্ড)*।

"কিগো বাছা আবার ডাক পাড়ছো কেন? ছিষ্টি সংসার সেরে যাব মাত্তর ওপরে উঠেছি — কি রাজকার্যে দরকার পড়লো শুনি?" *(পৃ. ২৫৫, ঘরও পৌষমাস, ঐ)*।

'আমায় ক্ষমা করো' গল্পে নবদ্বীপ মজুমদারের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী 'নতুন গিন্নী' গ্রীষ্মকালের রৌদ্র অসহ্য বোধ করে যে উক্তি করেন তা হলো — "মরছ আগুন জ্বেলে? পুড়িয়ে মারছো পৃথিবীকে? তোমার মরণ হয় না অনামুখো? ভর দুপুরে শাপ দিই তোমায় — জ্বলে পুড়ে মরো,

জ্বলে পুড়ে মরো।" — *(পৃ. ৭০, দ্বিতীয় খণ্ড, গল্প সমগ্র)*। বর্ষার দিনে একঘেয়ে বৃষ্টির শব্দে বলতেন — "ঝাঁটা খেকো দেবতা, কেঁদে মরছেন, কোন্ যমে ধরেছে তোমায়?" *(পৃ. ৭০, ঐ)*। পুত্রবধূর নিন্দাচর্চা করার ক্ষেত্রে নারীদের ভাষার আটপৌরে ভাবটা বেশ সজীব — "মরণ যে তোমার কেন হয় না মা, এও এক মস্ত আশ্চর্য!... কানু দেখলি তো বাবা? ও পাপিষ্ঠির নরকেও ঠাঁই হবে তুই ভাবিস?... কিসের তেজে এত মটমট কর্ছেন তাই ভাবি।... রূপ তো ওই ... গুণেরও সীমে নেই। ... যেদিন থেকে ঢুকেছে — সেদিন থেকেই যেন সব উড়েপুড়ে যাচ্ছে। মা লক্ষ্মী কোন পথ দিয়ে উধাও হয়ে গেলেন দেখতে দিলে না। নইলে এ সংসারের আজ এই দুর্দশা! উনি আজ পাঁচ বছর পক্ষাঘাতে পঙ্গু, টাটকা ছেলেটার এই অবস্থা, গোয়াল ভর্তি গরুগুলো সুদ্ধু পট্‌পট্ করে মরে গেল!" *(পৃ. ১০৯, অঙ্গার দ্বিতীয় খণ্ড)*। 'বেহুঁশ' গল্পে দুটি নারী চরিত্রের মধ্যে কথোপকথন চলছে — "আচ্ছা দিদি তোমার শ্বশুর বাড়িতে কেউ নেই বুঝি?" — "নেই কি লা? বালাই ষাট! সোনার বিন্দাবন, চাঁদের হাটবাজার। আমার শ্বশুরের ছয় ব্যাটা। শুধু আমার পোড়াকপালের আগুনে একটি খসেছে।" *(পৃ. ১০০, গল্প সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড)*। একেবারে আটপৌরে ভাষার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। 'পাকা ঘর' গল্পেও সেই অন্দরমহলের গভীরের চিত্রখানি উজ্জ্বল — "সেই যে বলে না — চোর দায়ে ধরা পড়া — আমার এ হয়েছে তাই। খাটতে খাটতে আপনার জান্ নিক্‌লে গেল — ভাত কাপড় দিয়ে গুরুকন্যে পোষা হচ্ছে! চোখের চামড়াকে বলিহারি দিই, খাবো আর শোবো — এ কি পিরবিত্তি বুঝিনে বাবা! পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেতে এতো মিষ্টি লাগে? আশ্চয্যি! *(পৃ. ২৩২, গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড)*।

'অনাচার' গল্পে সুভাষ কাকীমা সম্পর্কে পাড়ার মহিলাদের, বিশেষ করে যিনি কথক তার নিজেরই পিসি-কাকীমা-মায়ের উক্তিতে নারীদের নিরলঙ্কৃত ভাষাটা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়। "ওগো কার ভেতরে কি থাকে, সে শুধু সময় এলেই ধরা পড়ে! সুভাষ ছোঁড়া যখন ছিলো, তখন মনে হ'তো বুঝি এমন ভালোবাসাবাসি আর জগতে নেই। তারপর — ছোঁড়া হঠাৎ চলেই বা গেলো কেন তাই বা কে বলবে? আমার মন নিচ্ছে বৌয়ের ভেতরের অন্য গুণ টের পেয়েই সুভাষ মনের ঘেন্নায় চলে গেছলো! *(পৃ. ৩৪৭, গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড)*— এটি সুভাষ কাকীমার প্রতি পিসিমার উক্তি।

"শোন কথা! ভারি তো পদার্থ জিনিস, দুখানা তেলেভাজা কচুরি! তার আবার না খেলো না, হ্যানো হ'ল না — আমি কি খাচ্ছি না? বৌমা আমার যখন তখনই তো খাবার করছে।" *(পৃ. ১১৬, গল্প সমগ্র ৪র্থ খণ্ড)*। 'পত্রাবরণ' গল্পের অন্যতম নারী চরিত্র পঙ্কজের মা মহামায়ার উক্তি এটি। অভাবের তাড়না যখন নগ্ন আকার নিয়ে বেরিয়ে পড়ে তখন মাতা-পিতা-সন্তানের মধ্যেও গ্লানিকর দিকটিই বেশি প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। আর তাই 'পাতাল প্রবেশ' গল্পে আত্মসম্ভ্রমযুক্ত মেয়েকে মা গালি দেয় এই বলে — "কী বললি লক্ষ্মীছাড়ি? মেয়ে হয়ে তুই বাপের মরণবাক্যি মুখে আনিস? পয়সা

আনতে পারে না বলে সে বাপই নয় কেমন? সময়-অসময়ে আপনার লোকের কাছে হাত কে না পাতে? তাতেই তোমার মাথাকাটা যায়?" *(পৃ. ১৫৯, ৪র্থ খণ্ড)*। রাগে-দুঃখে অভিমানে মা মেয়েকে কেমন আটপৌরে ভাষায় শাসন করতে পারেন তারই সুচিত্র এখানে ফুটে উঠেছে।

"ঢের হয়েছে বাবা! আর নয়, বোনপোর বাড়ি এসে খুব সুখ করে গেলাম। চেরকাল মনে থাকবে। মরণদশা না হলে কেউ বৈমাত্র বোনের বেটা বোয়ের কাছে শরীর সারতে আসে না — মরণদশা ধরেছিল আমার তাই এসেছিলাম — তা' খুব শিক্ষে হলো। এখন দয়া করে আমাকে ছেড়ে দাও বাবা, বিদেয় হলে বাঁচি।" *(পৃ. ১৯০, গল্প সমগ্র চতুর্থ খণ্ড)*। আশ্রিতা সতাতো বিধবা মাসির (মায়ের সৎ বোন) উক্তি বোনপোর প্রতি। একেবারে মনের কথাটি সহজ-সরল ভাষায় বলে ওঠা যেন। এভাবে বলে ওঠার মধ্যে কোন শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন হয় না। নিতান্তই ঘরোয়া কথাকে আটপৌরে ভাবে বর্ণনা করা। আবার '—সচিবর' গল্পে দেখা যায় সংসারের নিয়মকানুন সম্পর্কে অবহিত করে দেবার মধ্যে লেখিকার সংস্কার চেতনার দিকটি — "না ভাই, ও কাপড়ে ছেলেপুলের ঘরে ঢুকতে নেই।... বাণী, অবাণী, চট করে তোর কাকার একখানা ধুতি নিয়ে আয় দিকিন?" *(পৃ. ২৩২ ঐ)*।

শিশুদের আলোচনা প্রসঙ্গে তাদের মুখে শিশুর উপযোগী ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে — "তুমি থাই বিথ্থিরি পতা" — (তুমি ছাই বিচ্ছিরি পচা)। 'বদ্ধ পাগল' গল্পে *(পৃ. ২৭১, ঐ)*। এভাবে শিশুদেরও ভাবার মাধ্যমে জীবন্ত করে তোলা হয়েছে। 'শিশু' গল্পেও একটি শিশুর উক্তি হল — "দুষ্টু পাজী লাক্কোস দূর যা" —। (দুষ্টু পাজী রাক্ষস দূরে যা)। "দুত্তু পাজি বাঁদোল লাক্কোস" — (দুষ্ট পাজী বাঁদর রাক্ষস) *(পৃ. ৭৭, গল্প সমগ্র প্রথম পর্ব)*। শিশু সুলভ চপলতা বোঝাবার জন্যে শিশুদের মুখে ব্যাঙ্গাত্মক ছড়ারও ব্যবহার করেছেন — 'ফেল হয়ে বাড়ি যায়, / ব্যাঙ্ পুড়িয়ে ভাত খায়।' *(পৃ. ৬১, গল্প সমগ্র ৪র্থ খণ্ড)*।

বস্তিবাসীদের মধ্যে যে কলহ হয়ে থাকে সেই অবস্থায় নারী পুরুষ নির্বিশেষে যে ভাষা তাদের মুখে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সেটাও আশাপূর্ণা দেবী সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত করেছেন। নারীকণ্ঠ ঃ "বলছি টাকা শুধবি কি যম এসে যখন গলায় গামছা বেঁধে নে যাবে তখন?" পুরুষ কণ্ঠ ঃ "মুখ সামলে কথা বলবি বলছি। খবরদার ওসব যম-ক্ষম বলবি না।" নারী কণ্ঠ ঃ — "কেন! মরণে এতো ভয়? চেরকাল বসুমতীর মাটি আগলে টিকে থাকবি না কি? একশোবার যম বলবো, হাজার বার যম বলবো। যম তোকে নেয়নি কেন তাই ভাবি।" — *(পৃ. ১৭৬, গল্প সমগ্র পঞ্চম খণ্ড)*। 'খবর নম্বর এক, দুই, তিন' গল্পেও রয়েছে বস্তিবাসী মায়ের মুখে পুত্রের উদ্দেশ্যে গালিগালাজ — "বলি তোর কেন মরণ হয় না রে পোড়ার মুখো? মর মর, অক্ষুণি মর! তোকে বাদামতলার ঘাটে জলসই করে এসে হরির লুঠ দিই আমি।" *(পৃ. ১৪, নির্বাচিত আশাপূর্ণা)*। মেয়েদের ক্ষেত্রে আটপৌরে অন্দরমহলের

ভাষা ব্যবহার করলেও গৃহভৃত্যদের মুখে যে ভাষা সুপ্রযুক্ত তাকেও আশাপূর্ণা দেবী অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। যেমন — নিরুপমা (১৩৫৩) গল্পে চাকর মাধোর মুখের সংলাপ — "ওই তো মাঠান তুমি পেত্যয় করছো না? এস্‌টেশন যে আসছে — কোট পেন্টুল দেখে আমি তো ভয়ে ভয়ে ছুট দেবার মতলব করছি, আমাদের বড়দাবাবু আমাকে ডাক দে বললো — 'কি রে মাধো, ভালো আছিস তো?"

"আমি বলনু — বড়দাবাবু তুমি পেলিয়ে গেলে — মাধান কেঁদে কেঁদে পড়লো। আর বলনু তোমার পোষাকটার যে কি বাহার —" *(পৃ. ১৩৪ ও ১৩৫, গল্প সমগ্র ২য় খণ্ড)*।

'অনাচার', গল্পে পঞ্চা কলুর ছোটমেয়ের মুখের বাচনভঙ্গী "হ্যাঁ দাদাবাবু, মা পেইঠে দেলো। বললে — "বুড়ো তো ম'লো, বামুন দিদি একা থাকবে? নন্দী, তুই যা আত্তিরটুকু থাকগে!" — "দাদাবাবু এবার ঘরে যাও। গাঁ ঘরের লোক তো ভালো নয়! কোথায় আনাচ কানাচ দে দেখবে, আর কুচ্ছো রটাবে। 'আত' হয়েছে তো!" — *(পৃ. ৩৫১ ও ৩৫২, গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড)*। 'হোমশিখা' গল্পেও রয়েছে গৃহভৃত্যদের উক্তি প্রত্যুক্তি — "মা, মিত্তিরদের বাড়ি, ডাক্তারবাবুর বাড়ি, সক্কল বাড়ি খুঁজে এলাম, কোথাও নেই দিদিমণি দাদাবাবুরা। সবাই বলছে কোথায় নাকি যতো ছেলেমেয়ে মিটিং করতে গেছে — তেনারাও গেছে হয়তো। ..." *(পৃ. ৬৪ — গল্প সমগ্র ২য় খণ্ড)*। 'যে নদী মরুপথে' গল্পে নিম্ন শ্রেণির এক নারী কণ্ঠের (ফেরিওয়ালী) উক্তি — "তা, বলি এতসব রাঁধবা কখন? দুটি বেলার তো মামলা, কাল সেঁঝের গাড়ীতে "যাত্তারা" তো — একজন মনিষ্যি খাবেই বা ক'ডা পেট নিয়ে?" *(পৃ. ১৭১, গল্প সমগ্র প্রথম খণ্ড)*। দেশ-কাল সম্পর্কে আশাপূর্ণা দেবীর যে সচেতনতাটুকু ছিল তাও ভাষার দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন 'উদ্বাস্তু' (১৩৫৫) গল্পে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত রিফিউজীদের মুখে সেখানকারই ভাষা বসিয়েছেন — "হালার পুত হালা ঘর ভাড়া দেওনের সাদ অইচ! দেড়শ' টাহা ভারা লওনের সাদ! মস্করা পাইচ হালা!... দেখুম কোন বিয়াকুব ভাড়া দেয়? নারায়ণ গঞ্জের ছাওয়ালরে চেন নাই বটে! হালার বাড়ি ছাড়ুম ... ভিটায় ঘুঘু চরাইয়া ছাড়ুম।" — *(পৃ. ৩১, গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড)*।

'দ্বন্দ্ব' (১৩৫৪) গল্পে একটি সাঁওতাল ভাষাভাষির নারী চরিত্র রয়েছে, যার মুখে ভাষার ব্যবহার অতি অল্পই দেখা যায়। কিন্তু যেটুকু রয়েছে তা সেই ভাষাতেই — 'ই-ইয়ে ... মাইজী, ... বাবু মরগেই' ... *(পৃ. ৩৭৭, গল্প সমগ্র ২য় খণ্ড)*।

আশাপূর্ণা দেবীর রচনারাজির দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখা গেল তিনি যেমন অত্যন্ত সাধারণ মানের জীবনযাত্রায় বিশ্বাসী ছিলেন, তেমনি সাধারণ মানুষের কথাই তাঁর রচনাতে তুলে ধরতেন। কারণ তিনি যে সময়ে লিখতে শুরু করেছেন তখন সমাজের মানুষেরা গৃহাভ্যন্তরের নারীদের অত্যন্ত সাধারণ মানের মানুষ ছাড়া কিছু ভাবতো না। আবার নারীরাও এই পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে

চলতে চলতে নিজেদের পৃথক কোন সত্তার অধিকারী বলে মনে করতো না। তাই যেসব নারীরা যখন কথাবার্তা বলতেন তখন তাদের মুখে একেবারে নিপাট আটপৌরে, মেয়েলী ভাষাটাই উঠে আসতো। এসব ভাষা তাদের চরিত্রকে সজীব করে তুলত এবং লেখিকাও যে কতটা আন্তরিকভাবে তাদের উপলব্ধি করতেন তা সপরিস্ফুট হয়ে উঠত। শুধু ভাষা অর্থাৎ বাক্য ও সংলাপ ব্যবহার নয়, রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ ব্যবহার রয়েছে শব্দচয়ন। আশাপূর্ণা দেবী নিজে ছিলেন অন্তঃপুরের মেয়ে, গৃহবধূ। অন্দরমহলের বাইরে কোলাহল মুখর, জনবহুল অঞ্চলের মধ্যে তাঁর পদচারণা ছিল না। তিনি যখন খ্যাতির মধ্যগগনের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন তখন বহির্জগতে তার পদক্ষেপন শুরু। সুতরাং তাঁর লেখার বিষয়বস্তু যেমন বেশিরভাগটাই অন্দরমহলের, শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কতকটা তাই হয়েছে। সেই শব্দগুলোর নিদর্শনই এখানে তুলে ধরা হোল যতটা সম্ভব। যেমন - 'চুড়োমণি যোগ', 'এ্যালমিলিয়ামের', 'সংসারের গর্তে', 'ঠ্যাকরি', 'রাই ধরো ধরো', 'পেন্নাম', 'আস্তাকুড় ধাঙড়' (গালি) 'সোমত্ত মেয়ে', 'হরঘড়ি' (শীঘ্র), 'খুড়ো শউর', 'সংসার কন্না', 'বাইগ্রেস্থ', 'আবাণে', 'শেতল', 'সুবন্নপুরী', 'যাত্তারা', 'মনিষ্যি', 'দুয়োর', 'পব্বত', 'গিরিস্যকাল', 'কারে পড়া' (বিপদ), 'থরহরিকম্প', 'থুপুস', 'মুখদেখানি', 'কেলাশ', 'ফেরেনড়', 'বুনঝি', 'নাথসুতো', 'ঘটকিনী', 'কড়কে', 'দারিদ্দির দশা', 'সূয্যি', 'পেরজা', 'ন্যাবণচুষ', 'দুগ্‌গো পিতিমে', 'পেসাদী', 'থল-কূল', 'হিরোন', 'ছুটিং', 'ছুডিও', 'হাচোট-পাচোট', 'কোট পেন্টুল', 'পয়লট্ট', 'অখাদ্য, অবাদ্য', 'নড়েভোলা', 'চাল বাড়ন্ত', 'পিত্যেশ', 'একগঙ্গা (প্রচুর অর্থে)', 'কাঁসি', 'বোলবোলাও', 'পেত্যয়', 'এস্‌টেশন', 'এনু', 'ছিষ্টি', 'মাঠান', 'এসিস্‌টেন্ট', 'হাওয়া গাড়ী', 'চিপটেন', 'পুঁয়ে পাওয়া', 'ছেরাদ্দ', 'ধাষ্টামো', 'মন-মজানি', 'পেইঠে', 'আত্তির', 'ফরাসড্যাঙা', 'দাঁত খিচিয়ে', 'নৈবিদ্যি', 'মুখিয়ে থাকে', 'তুক তাক্', 'গুণবশীকরণ', 'ন্যাঙড়া', 'মনটা করকর করছিল', 'নবাবী কেত্তন', 'নিষ্ঠা কাষ্ঠা', ' কেসত্তা', 'দোনা', 'খোট', 'এস্‌টোভ', 'ধাবধারা গোবিন্দপুর', 'ব্যাখ্যানা', 'একাল যেঁড়েপনা', 'ক্ষেত্তর', 'আতান্তর', 'অবিশ্যি', 'বদ্যিবাটী', 'কেকঁড়ি', 'আড়ায়', 'ভেন্ন' 'ভাবন', 'আসপদ্দা', 'আদুল', 'একটিনি', 'খাল', 'পোকল্প', জরদ্‌গবো', 'নিয্যস', 'ক্ষেতি', 'মানাস (মানুষ)', 'নোভ) (লোভ)', 'হতমান্যি',

এ সমস্ত শব্দের ব্যবহার চরিত্রগুলোকে বিশেষতঃ নারী চরিত্রগুলোকে যেন চোখের সম্মুখে মূর্তিমান করে তুলেছিল। আশাপূর্ণা দেবী মনের নিভৃতে সঞ্চিত যে অসীম দরদ তার ধারায় স্নাত করিয়ে চরিত্রগুলোকে বিকশিত করে তুলতে চেয়েছেন পরিপূর্ণভাবে। তাঁর রচনারাজির সার্থকতার এটাও একটা বিশেষ দিক।

আশাপূর্ণা দেবীর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে কাব্য চেতনা রয়েছে। তিনি নিজেও অনেক কবিতা লিখেছিলেন। অনেক গল্পে দেখা যায় নানা চরিত্রদের মুখে পরিবেশ অনুযায়ী নানা কবিতা ও সংগীতের দু'এক ছত্র দিয়েছেন। যেমন — "প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে" — *(নব কথামালা, পৃ.*

৩৩৩, *গল্প সমগ্র ১ম খণ্ড*)। "আমায় বাঁশীতে ডেকেছে কে, ওগো ললিতে" *(রাহু, পৃ. ১১৮, ২য় খণ্ড)*। "পবিত্র তুমি, নির্ম্মল তুমি, তুমি দেবী তুমি সতী; কুৎসিত দীন অধম পামর পঙ্কিল আমি অতি।" *(পৃ. ১১৯ ঐ)*। "ধরণীর ধূলি ধুয়ে — দেখি তারে থুয়ে থুয়ে" (সাগর শুকায়ে যায়, পৃ. ২৯০, ২য় খণ্ড) "আপনা বিস্মৃত প্রেমে বিলাইছ আপানারে / কি মধুর সুখে। / শুধু স্নেহ, শুধু সেবা, শুধু প্রাণভরা প্রীতি / ভরা আছে বুকে।" — *(পৃ. ২৯২, ঐ)*। "বৈকুণ্ঠের কণ্ঠ হ'তে হেথা কি পড়েছে খসে — / পারিজাত ফুল? / অথবা এ মর্ত্তলোকে অমৃতের নির্ঝরিণী — / বিধাতার ভুল।" — *(পৃ. ২৯৪, ঐ)*। "মাধবী রাতে এ - এ মম মন বিতানে — / মল্লিকা মঞ্জরী গুঞ্জরে — হা-য়।" *(পৃ. ৩১২, মুস্কিল আসান, ২য় খণ্ড)*। 'আমার খোকা করে গো যদি মনে — এখনি পারে উড়ে যেতে সে পারিজাতের বনে' — *(পৃ. ৩, বন্দিনী, গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড)*। 'তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি / শতরূপে শতবার / যুগে যুগে অনিবার। / চিরকাল ধরে —" *(পৃ. ১৬৭, আর একদিন ৪র্থ খণ্ড)*। 'কেন তুমি মূর্ত্তি হয়ে এলে, রহিলে না ধ্যান ধারণায়' *(পৃ. ২৮০, ছিন্নমস্তা, ২য় খণ্ড)*। "সদ্য এই জীবনের দলগুলি' দুহাত ভরে দিলাম হে নাথ তোমার পায়ে অঞ্জলি ..." *(পৃ. ৩৩২, একরাত্রি ২য় খণ্ড)*। "লক্ষণ হানিল বাণ মারে ঠাকুর লক্ষণ।/ বৈষ্ণব বাণেতে বীর করে নিবারণ।" *(পৃ. ২১৩, ২য় খণ্ড লড়াই)*।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতি আশাপূর্ণা দেবীর ছিল অসীম শ্রদ্ধা। তিনি নিজে ছিলেন তাঁর অন্ধভক্ত এবং তাঁর রচনাগুলোতেও তিনি কবিগুরুর কবিতা বা সংগীতের পংক্তি নানা চরিত্রদের মুখে ব্যবহার করেছেন। এগুলো ব্যবহারের ফলে সে সমস্ত চরিত্রের মধ্যে একটা কাব্যিক ও সংগীত প্রীতির দিক ফুটে উঠেছে যা চরিত্র তথা গল্পটিকেই সার্থক প্রতিপন্ন করে তুলেছে।

আশাপূর্ণা দেবী চরিত্রোপযোগী ভাষা, শব্দ যেমন ব্যবহার করেছেন গল্পগুলোতে তেমনি তাদের মুখে পরিস্থিতি পরিবেশ অনুযায়ী কবিতা ও সংগীত ব্যবহার করে কাব্যপ্রীতিরও পরিচয় দিয়েছেন। আবার উপমা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট নিপুণতা ও সৌন্দর্য্য চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। উপমাগুলো ব্যবহারে বেশ অভিনবত্বও রয়েছে। নিম্নে তার কিছু উদ্ধৃত করা হোল —

১। "হাসি তো নয়, জলতরঙ্গ বাজনা — নিজের কানেই যেন ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া ওঠে।" — *(পৃ. ১৬৭, 'যে নদী মরুপথে' ১ম খণ্ড)*।

২। "ওপারে ঠিক সামনেই আকাশের মাঝখানে মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে একটা বাজপড়া তালগাছ বিধাতার অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের মতন।" *(পৃ. ১৬২, অভিশপ্ত, ২য় খণ্ড)*।

৩। "আজ ছায়ার ব্যবধান ঘুচে প্রখর সূর্যের নীচে এসে দাঁড়াতে হল উর্মিলাকে" ছায়া অর্থে স্বামী আর 'প্রখর সূর্য' অর্থে শ্বশুর) *(পৃ. ১৬৫, ঐ)*।

৪।"ওদের মোটরগাড়ির আলো পিছলানো মসৃণ দেহে পালিশের যে গাম্ভীর্য, সেই গাম্ভীর্যের পালিশ

ওদের চেহারায়।" *(পৃ. ২৬৩, সংক্রামক, গল্প সমগ্র ৪র্থ খণ্ড)*।

৫। "মৌমাছি পরিবেষ্টিত মধুচক্রের মতো, শ্যালিকা পরিবেষ্টিত বাসরের বরের মতো, বালক পরিবেষ্টিত ঘুগনিওলার মতো, আমি বিরাজ করিতেছি তাঁহাদের মাঝখানে।" *(পৃ. ২৬৭, সংক্রামক, ঐ)*।

৬। "সিমেন্টের দেওয়ালের ফাটলে অশ্বত্থ চারার উঁকি দেওয়ার মতো আমি একটা মারাত্মক কাজ করে বসলাম।" *(পৃ. ২৫৯, ভবিষ্যৎবাণী, ঐ)*।

"ওদের ওই দাম্পত্য জীবনের মধ্যে অশোকেরও একটা স্থান আছে। বিশিষ্টও নয়, অপরিহার্যও নয়, তবু আছে—"

৭। "ভাতের সঙ্গে থালার আগায় নুনের মতো, পানের সঙ্গে ডিবের কানায় চুনের মতো।" *(পৃ. ১৬৯, আর একদিন, ঐ)*।

৮। "সংসারের অনন্ত মালিন্যের ঊর্দ্ধে ফুটে থাকা শতদলের মতই অনির্বচনীয় সরমা।" *(পৃ. ৭৪, প্রলাপ, গল্প সমগ্র ৫ম খণ্ড)*।

৯। "নিটোল একটি ডাঁসা ফলের মত লাবণ্য পিছলে পড়া মুখটি" — *(পৃ. ৩৯৭, এক যে রাজা, ঐ)*।

১০। "কথা তো নয়; যেন গানের ঢেউ।" *(পৃ. ৩৯২, ঐ)*।

আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পগুলোতে সমাজের অভ্যন্তরের চিত্রগুলো এত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, যার দ্বারা কল্যাণী, অহংকারী, স্বার্থলিপ্সু, অসহায়া, সাহসী — সমস্ত রকমের নারী চরিত্র জীবন্ত রূপ নিয়ে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। তেমনিভাবে সমাজে বিধবাদের কিভাবে দেখা হোত তাও তিনি দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন বিখ্যাত গল্প 'ছিন্নমস্তা' তে তিনি দেখিয়েছেন বিধবা জয়াবতীকে সামান্য ডাঁটা চচ্চড়ি খাওয়া নিয়ে তারই পুত্রবধূ প্রতিভা খোঁটা দিচ্ছে — "তা বলে বিধবা মাগীদের মতন গাদাগাদা চচ্চড়ি খাবার এতো সখ নেই আমার। নামিয়ে দিয়ে নষ্ট করলেন কেন, রাখলেই পারতেন নিজের জন্যে! আপনার লোভের জিনিস" — *(পৃ. ১৬৮, আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প সংকলন)*। জয়াবতীও পুত্রবধূ বিধবা হবার পর বলেন — "ভালো জিনিস খাওয়ার বরাত তো ঘুচিয়েছেন ভগবান, পোড়া বিধবার গুচ্ছির শাক-পাতা ডাল চচ্চড়ি না খেয়ে উপায় কি?"

"বিধবার পরমায়ু মার্কণ্ডেয় পরমায়ু, না খেলে চলবে কেন? কচু, ঘেচু শাক পাতাই খেতে হবে গুচ্ছির।" *(পৃ. ১৭০, ঐ)*। বিধবাদের খাওয়া দাওয়ার আয়োজনে থাকতে পারবে না কোন আড়ম্বর। তাদের এই আহার পর্বটাও যেন দৃশ্যমান কোন একটা দর্শনীয় জিনিস, পাড়া প্রতিবেশীর দল তা দেখতে ছুটে আসেন। "মহিলা সমাজের চিত্ত জগতে প্রতিবেশীর ঘরের সদ্য বিধবার আহার-বিহারটা তার চাইতে কিছু কম নয়, হয়তো বা বেশি ... কাজেই — প্রায়ই ঠিক আন্দাজমতো সময়ে জয়াবতীর বাড়িতে আবির্ভূতা হন কনকলতা, লাহিড়ী গিন্নী, মন্টির মা। ... " *(পৃ. ১৭১, ঐ)*।

লেখিকার সুচারুরূপে বর্ণনা আমাদের সম্মুখে যেন একেবারে ছবির মত দৃশ্যপট সহ প্রকাশিত হয়।

'সবদিক বজায় রেখে' গল্পেও বিধবাদের উদ্দেশ্যে অবহেলাকর উক্তি করা হয়েছে — "কেন? আমি কি একটা আলতু ফালতু বিধবা? যে সব সময়ে পরের নেজুড় হয়ে কোথাও যেতে হবে?" অর্থাৎ বিধবাদের অসহায়তা, পর নির্ভরশীলতার সঙ্গে স্বামী সোহাগিনী সৌভাগ্যবতীরা নিজেদের বৈসাদৃশ্য বর্ণনা করেন। আর এ থেকেই বোঝা যায় যে, বিধবারা সংসারে ভীষণভাবে গুরুত্বহীন অবাঞ্চিত। 'বেহুঁশ' গল্পেও রয়েছে বিধবাদের আচার আচরণের প্রতি কটাক্ষপাত। "অসভ্যর মতো হাসছে দেখো। বিধবা মানুষের অতো হাসি কেন? দেখলে গা জ্বলে যায়।" *(পৃ. ৯৮, গল্প সমগ্র তৃতীয় খণ্ড)*। "সত্যিই তো বিধবা মানুষের পক্ষে এরকম বাচালতা বে-আইনি বৈকি!" *(পৃ. ৯৯, ঐ)*। 'পাকা ঘর' গল্পেও রয়েছে একই প্রতিচ্ছবি — "একলা মানুষ বিধবা, তার যে আস্ত একখানা ঘরের কি দরকার বুঝিও না। এইতো — আমার শ্বশুরবাড়িতে পিসশাশুড়ি সামনেই ভাঁড়ার ঘরে থাকেন।" *(পৃ. ২৩২, তৃতীয় খণ্ড)*। বাড়ির মেয়ে চন্দনা নিজের জ্যেঠাইমাকে এবং পিসি শাশুড়িকে বিধবাদের বিলাসহীন জীবনচর্যার কথা বলেন। সংসারের ঘূর্ণচক্রে সেই চন্দনার মাকেও একদিন বিধবা বলেই জঞ্জালের মতো ভাঁড়ার ঘরে এসে আশ্রয় নিতে হয় — "চাঁপাও তো একলা বিধবা মানুষ, আস্ত একখানা ঘরে দরকার কি তার?" *(পৃ. ২৩৬, ঐ)*। "অ হাবা মেয়ে, বামনের ঘরের 'বিধবা' — তামাসার ছলেও অমন কথা মুখে আনতে নেই বাছা! মহাপাপ, মহাপাপ, কত জন্মের পাতকের ফলে এ জন্মের এই দুর্গতি, আর পাপ বাড়াস্‌নে বাছা!" *(পৃ. ২১, গল্প সমগ্র প্রথম খণ্ড)*। 'রাজুর মা' গল্পের উক্ত উক্তিটি বিধবাদের জীবনযাত্রার নিয়মাবলীর দিকটাই নির্দেশ করে।

দেশাত্মবোধ ঃ

আশাপূর্ণা দেবী চিরকাল গৃহাভ্যন্তরে বসবাস করলেও এবং মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রাকে তাঁর রচনার উপাদান হিসেবে ব্যবহার করলেও দেশ-কাল সম্পর্কে যে একেবারে অবহিত ছিলেন না তা নয়। তাঁর রচনার প্রথমার্ধের অনেকটা জুড়ে (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ; ১৯৩৯-১৯৪৫) যুদ্ধের আবহাওয়া বিরাজিত ছিল, আর সেই প্রভাবটা তাঁর গল্প সমূহে সামান্য হলেও পড়েছে। যুদ্ধ বোমা সংক্রান্ত বিষয়ের কিছু কিছু উল্লেখ রয়েছে, ঠিক যতটা মধ্যবিত্ত সমাজের অন্দরমহলে বিরাজিত চরিত্রদের মধ্যে থাকা সম্ভব। এতে অবশ্য তাদের জীবনযাত্রার খুব একটা কিছু পরিবর্তন হয়নি। কিছু উক্তির সাহায্যে এই দিকটা দেখানো হল —

"যে দুরন্ত বোমাতঙ্কে ভারত যুদ্ধ লোক জলাতঙ্ক রোগীর মত ক্ষেপিয়া ছুটাছুটি করিতেছে, সেই অনাগত বোমায় অসঙ্গত বিলম্বই সরসীবালার অসন্তোষের কারণ।" *(পৃ. ২৫৫, গল্প সমগ্র ১ম খণ্ড)* 'কারও পৌষমাস' (১৩৪৮ সন)। "পোড়ার মুখো জাপানী আমার মাথায় একটা বোমা কবে ফেলবে রে" — *(পৃ. ঐ—ঐ—ঐ)*। "সবাই বলছে — 'চলে যাও চলে যাও — পালাও পালাও'

— আরে বাবু ছেলেরা পড়ে থাকবে বোমার মুখে — কর্তার নড়বার জো নেই — সরকারের চাকর, তিনি থাকবেন। আমার প্রাণটাই বড় হ'ল?" *(পৃ. ২৪৯ — ঐ — ঐ)*। "তোমার গুজব আফিসের খবর বল। টোকিও রেডিও কি বলছে? 'আজাদ' স্টেশন কি বলছে?" (পৃ. ৩৬৭ ১ম খণ্ড — গল্প — 'ছুটির একবেলা' (১৩৫০ সন)। "পৃথিবীতে বাধলো লড়াই, বাজারে লাগলো আগুন, সেও বোধকরি আমার অপরাধ।" (পৃ. ১১৩, গল্প সমগ্র ২য় খণ্ড, গল্প 'অঙ্গার' (১৩৫৩ সন)। "রোসো মা, যুদ্ধের হাওয়ায় তুমিও মিলিটারী হয়ে উঠো না।" (পৃ. ৪৭ ২য় খণ্ড, কার্য-কারণ (১৩৫২ সন)। "সন্দেহ করিবারও কিছু নাই, এটা যে যুদ্ধের বাজার! এ যুগের অভিধানে অসম্ভব বলিয়া কোন শব্দ নাই, সবই সম্ভব।... এ যুদ্ধের ঝোড়ো হাওয়ায় অনেকের কপালেরই পাতার আবরণটুকু উড়িয়া গিয়াছে যে!" (পৃ. ১২৩ — ঐ — পদ্মলতার স্বপ্ন (১৩৫৩ সন)। "বোমাকেও আপনি হুজুগ বলে উড়িয়ে দিতে চান? যে বোমায় এক মিনিটে একটা দেশ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে!" (পৃ. ২৮ গল্প সমগ্র ৩য় খণ্ড, উদ্বাস্তু ১৯৪৯ সন) "অথচ আমাদের এদিকে — বোমার গন্ধও ছিল না। এইতো আমরা রইলাম — কি হল?" *(পৃ. ঐ — ঐ — ঐ)*। "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রলয় মেঘ তখন পৃথিবীর কোন ঈশানকোণে সঞ্চিত হইতেছিল কে জানে, আমরা তার ছন্দাংশও জানিতাম না। পরম শান্তিতেই ছিলাম।" (পৃ. ৮২ ঐ সিঁড়ি ১৩৫৫ সন)। "বোমাতঙ্কহীন নিরাপদ একটি আশ্রয়ের সন্ধানে যখন জলাতঙ্ক রোগীর মত ছুটোছুটি করিতেছি ...।" *(পৃ. ৮৪ ঐ, ঐ)*। "সে যাক্ যুদ্ধের হুজুগে দেশটার কপাল ফিরল দেখছি। সুশীল সেনের বাড়ির কথা বলছিলাম না সেদিন? আজ দেখি উপেন রায়ের বাড়িও মিস্ত্রি লেগেছে আজকালের মধ্যে আসবে মেয়েরা।" (পৃ. ২৩৭, গল্প সমগ্র ১ম খণ্ড, ধুলি ধূসর)। "রাঁচী নয় — করাচী তা'হলে।... খুব নাকি বিপদের জায়গা, বোমা পড়ে তো — ওখানেই আগে পড়বে।" *(পৃ. ঐ, ঐ, ঐ)*।

আশাপূর্ণা দেবীর ছিল ভীষণ কোলকাতা প্রীতি। তিনি এই শহরকে মনেপ্রাণে ভালোবাসতেন। যেখানেই যেতেন না কেন এখানেই ফিরে আসার জন্য বড্ড আন্তরিক টান অনুভব করতেন, এই মনোভাবের ছাপ পড়েছে তাঁর রচিত গল্পেও। যেমন — "সোনার শহর কলিকাতা — আজব শহর কলিকাতা, ইন্দ্রভূষণ কলিকাতা, মর্তে অমরাবতী কলিকাতা — তাহার আজ কি হাল! কলিকাতাবাসী আজ সব থাকিয়াও সর্বহারা।" *(পৃ. ২৬৩, গল্প সমগ্র ১ম খণ্ড, 'কারও পৌষমাস')* — কোলকাতার প্রতি এই প্রীতি থেকেই তিনি নগরকেন্দ্রিক সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর রচনায় গ্রামগঞ্জের বাড়িঘর পরিবারের কথা থাকলেও গ্রামের পরিবেশ বর্ণনার কথা বলা নেই। তিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নগর সভ্যতার পটভূমিকায় কাহিনি গ্রথিত করেছেন। পরিবেশের বর্ণনার চাইতে চরিত্র এবং কাহিনিই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

আশাপূর্ণা দেবী সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে শিল্পরূপের জন্য কখনোই ভাবিত ছিলেন না।

কখনোই তাঁর মনে হয়নি, যা বলতে চেয়েছেন নিজের মতো করে তা না বলে আঙ্গিক, গঠন কৌশলের দিকে আগে দৃক্‌পাত করা প্রয়োজন। যেমন মনে হয় নি বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে বিদেশি সাহিত্য পাঠের আবশ্যকতা রয়েছে। তিনি মনে করতেন জীবনে যা ঘটে জীবনধর্মী সাহিত্যে তার সবটাই আসতে পারে। আর এ বোধটাকেই ঠাঁই দিয়েছেন প্লটে। তিনি ভাষার ক্ষেত্রে শালীনতাকে পছন্দ করতেন। সুচিন্তিত, সুনির্বাচিত, প্রয়োজনানুযায়ী শব্দচয়নও তিনি তাঁর রচনায় করে গিয়েছেন। চরিত্রের ক্ষেত্রে তিনি তো বলেই থাকেন যে, ঘটনা প্রধান নয়, আবেগ প্রধান নয়, চরিত্র প্রধান গল্পই তিনি প্রকৃতপক্ষে লিখে থাকেন। সমাজের প্রতিই তাঁর দৃষ্টি সমগ্রটাই নিবদ্ধ ছিল বলে সমাজে সংসারে অবহেলিত নারীদের নানান সমস্যা, নারীত্ব-ব্যক্তিত্ব-মর্যাদাবোধে জাগ্রত নারীর কথা, আবার সংসার-যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া নারীর কথা সবই স্বচ্ছ সাবলীল প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরেছেন। কাহিনি তৈরিতে কোন জটিল প্লট নির্মাণ নয়, সরল একমুখী ঘটনা বিন্যাসেই বাস্তব সত্যকে, যা নিজ চোখে দেখা, তাই গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন।